মতামত ও লেখা পাঠানো সহ
সমস্ত ধরণের যোগাযোগ:
সম্পাদক
শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র
শ্রমিকশক্তি
১১, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা-৯
ফোন : ৯৪৩৩২৪২৪৯৮
(বৃহস্পতিবার, ১১-২ টা)
shramikshakti@gmail.com

শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র

শ্রমিকশক্তি

ভিতরের পাতায়

- সুশীল সমাজ, সিপিএম এবং কার্লমার্কস
- ভোটসর্বস্ব জোট নাকি লড়াইয়ের ঐক্য
- পানীয় জল দূষণ—উৎসের সন্ধানে
- সিঙ্গুর এবং হাইকোর্টের রায়
- বলাগড় : নির্বাচনী ফলাফলের শিক্ষা
- গণশক্তির ভন্ডামি

৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০৮ বিনিময় : ২ টাকা

নন্দীগ্রামের পর আরেক প্রতিরোধ সংগ্রাম

গোয়ায় আটকে গেলো ‘সেজ’

কুশল দেবনাথ : বহু জীবনের বিনিময়ে নন্দীগ্রামে ‘সেজ’ প্রকল্প প্রতিহত হয়। সালিমদের দিয়ে কেমিকাল হাব গড়ার যে পরিকল্পনা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পরিচালিত সরকার গ্রহণ করেছিল, নন্দীগ্রামের মানুষ সেই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়। একইভাবে সম্প্রতি গোয়াতে মানুষের প্রতিরোধ আন্দোলনের চাপে গোয়ার কংগ্রেস সরকার সমস্ত ‘সেজ’ প্রকল্প বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় বাণিজ্য সচিব এসআর পিল্লাই বলেছেন, এভাবে প্রকল্প বাতিল করা যায় না। কারণ সেজের জন্য বহু টাকা ইতিমধ্যে বিনিয়োগ হয়েছে। এসে গেছে করমুক্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি। কিন্তু তবু অনড় গোয়াবাসী। গোয়ার মানুষের প্রতিরোধ সংগ্রামে উজ্জীবিত দেশের বিভিন্ন ‘সেজ’ প্রকল্পের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সাধারণ মানুষ।

কীভাবে এই প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠল গোয়াতে? আমরা জানি গোয়া মূলত পর্যটন-নির্ভর রাজ্য। পর্যটনকে কেন্দ্র করে গোয়ার অর্থনীতি আবর্তিত হয়। সুতরাং একদিকে যেমন হোটেল ব্যবসা রয়েছে আবার গোয়াবাসীরা অসংখ্য ছোট ছোট ঘর ভাড়া দেয় পর্যটকদের জন্য। এক বিরাট সংখ্যক মানুষের জীবন-জীবিকা গড়ে উঠেছে একে কেন্দ্র করে। গোয়াতে সেজের অনুমতি পায় বিখ্যাত বিল্ডার কোম্পানী রাহেজা কর্পোরেশন, ওষুধ কোম্পানি সিপলা সহ বিভিন্ন সংস্থা। রাহেজা কর্পোরেশন ‘সেজ’ প্রকল্পে হোটেল থেকে বহুতল নির্মাণ করার উদ্যোগ নেয়। এর জন্য বিশেষ করে যে সমস্ত মানুষেরা ছোট ছোট ঘর বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের ভয়ংকর ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ওষুধ কোম্পানি হলে গোয়ার পরিবেশগত অবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যার প্রভাব পড়বে পর্যটন শিল্পের ওপর।

অতএব গোয়ায় গড়ে ওঠে সেজবিরোধী বাঁচাও কমিটি। মূলত সাধারণ মানুষেরা নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদে এই কমিটি গড়ে তোলেন। নন্দীগ্রামের লড়াইয়ের পাশে যেমন এগিয়ে এসেছেন শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা, একইভাবে গোয়ায় গায়ক রেমো ফার্নান্ডেজ, হেমা সারদেশাই- এর মতো প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা ‘সেজ’ প্রকল্পের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। জনসাধারণের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এই লড়াইয়ে সামিল হয়। আন্দোলনকারীরা ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত পর্যটকদের গোয়া ছাড়ার আবেদন জানান এবং সরকারের সাথে হেস্তনেস্ত করতে উদ্যোগী হয়।

অবশেষে জনতার তীব্র চাপে নতিস্বীকার করে কংগ্রেস সরকার। প্রত্যাহৃত হয় সমস্ত ‘সেজ’ প্রকল্প। গোয়াবাসীর এই সংগ্রাম প্রমাণ করলো ঐক্যবদ্ধ লড়াই গড়ে তুলতে পারলে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের কর্মসূচীগুলো প্রতিহত করা যায়। ইতিহাস সৃষ্টিকারী গোয়াবাসীদের সংগ্রামী অভিনন্দন।

পুঁজিবাদ আর ন্যানোয় মজেছে সিপিএম

শমীক চক্রবর্তী: ঝলমলে আলো আর নাটকীয়তায় ভরা এক ‘শো’তে টাটার কর্ণধার রতন টাটা দিল্লীর প্রগতি ময়দানের অটো এক্সপোতে তার ‘উপহার’ একলাখি ‘জনতার গাড়ি’ টাটা ন্যানো জনসমক্ষে হাজির করলেন। দামটা অবশ্য বলা হল মার্কিন ডলারের হিসেবে— ২৫০০ মার্কিন ডলার (যদিও তার দূষণ সংক্রান্ত মান অনুসারে তা মার্কিন মুলুকে এখনও বিক্রীর অযোগ্য, সেই যোগ্যতা মান অর্জন করার প্রযুক্তি যোগ করতে আরও এক হাজার ডলার দাম বাড়াতে হবে)। যাই হোক, সে গাড়ি মিডিয়ার ভাষায় ‘বহু প্রতীক্ষিত’। এত ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রতীক্ষা করছিলো যে মিডিয়া, তাকে তো আবার একটা মশলা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হয়। অতঃপর নতুন রসদ টাটা ন্যানো নিয়ে বাজার সরগরম— একদিকে গুণকীর্তন মিডিয়ার, ঢোঁক গেলা টাটার প্রতিদ্বন্দ্বীদের আর অন্যদিকে আমেরিকা আর ইউরোপ থেকে পরিবেশ সহ নানা বিষয়ে প্রশ্ন উঠে আসা... তার সওয়াল-জবাব... কি দারুণ জমে উঠেছে জলসা! সে জলসায় টক-ঝাল-নোনতা স্বাদ জুড়েছে স্বয়ং রতন টাটার মন্তব্য— গাড়ির নাম নাকি হতে পারতো বুদ্ধবাবুর নামে কিংবা হতে পারতো ‘মমতা সত্ত্বেও’ ইত্যাদি ইত্যাদি। গল্পের ঠাসবুনোট আরও পাকা হল যখন শোনা গেল রতনবাবু নাকি এক বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় এক কাকভেজা ছোট পরিবারকে দেখে এই ছোট গাড়ি তৈরীর কথা প্রথম ভেবেছিলেন। এ গল্প থেকে যে একটা বলিউডি ছবির প্লট বেরোবে তা আমার মত আনাড়ী ভবিষ্যৎদ্রষ্টারও বুঝতে অসুবিধা হয় না। মালিকী স্বার্থে চলা সমাজে মালিকদের নামে ভালো ভালো গল্প লাগে পাবলিককে খাওয়ানোর জন্য, জনমানসে ‘ইমেজ’ তৈরীর জন্য। বিড়লা থেকে বিল গেটসের নামে এরকম ‘জীবনসংগ্রাম’-এর গল্প আকছার বাজারে শোনা যায়, তাদের শ্রমিকশোষণের ভয়ঙ্কর সব নমুনার পরও গল্পগুলো লোকমুখে ছড়ায়, শোষিত মেহনতী মানুষ সে গল্পগুলো নিয়ে মজেও থাকে হরবখত। টাটা বেচারা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে, তার আর এরকম ‘স্ট্রাগল’ করে বড় হওয়ার কাহিনী জোটে কি করে! অতঃপর বৃষ্টিস্নাত ছোট পরিবারের প্রতি সহানুভূতির মত দারুণ সিনেম্যাটিক প্লট আমদানি ‘সংবেদনশীল’ টাটার।

এই গল্প থেকে শুরু করে ন্যানোর জন্ম— এই নিয়ে যে মজে থাকবেন বহু মানুষ—

শেষাংশ ৩ পৃষ্ঠায়

গুজরাট ও হিমাচলে ক্ষমতায় বিজেপি

জাতীয় ও রাজ্য রাজনীতিতে প্রভাব কী ?

বিশেষ প্রতিবেদন: সম্প্রতি গুজরাট ও হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে জিতে গদিতে বসলো বিজেপি। দেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য গুজরাটে গতবারের চেয়ে ১০টি আসন কম পেলেও নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ক্ষমতা ধরে রাখলো বিজেপি। হিমাচল প্রদেশে গতবার গদিতে ছিল কংগ্রেস। ৫ বছর পর আবার এখানে বিজেপি ক্ষমতায় ফিরে এলো।

২০০২ সালে, দাঙ্গা বিধ্বস্ত গুজরাটে উগ্র হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাকে অস্ত্র করে ক্ষমতায় এসেছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। মোট ১৮২টি আসনের মধ্যে ১২৭টি আসনে সেবার বিজেপি জিতেছিল। কংগ্রেস পেয়েছিল ৫১টি আসন। বর্তমান নির্বাচনে ১১৭টি আসনের দখল নিয়েছে বিজেপি, কংগ্রেসের ঝুলিতে গেছে ৬২টি আসন। হিমাচল প্রদেশের মোট ৬৮টি আসনের মধ্যে গতবার কংগ্রেস পেয়েছিল ৪৩টি আসন, বিজেপি ১৬টি। এবারের নির্বাচনে ফলাফল প্রায় উল্টে গিয়ে কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ২৩টি আসন, বিজেপি ৪১টি।

দেশের অন্যতম বৃহৎ রাজ্য গুজরাটে বিজেপি’র জয় এবার নানান কারণেই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, নরেন্দ্র মোদী যে এবারেও জিতবেন, তা নিয়ে দেশের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু অনেকেই ভেবেছিলেন আসন সংখ্যা এবার অনেকটা কমবে; জিতলেও নরেন্দ্র মোদী টায়-টায় জিতবেন। মোদীর সামনে প্রতিবন্ধকতাও ছিল বিস্তর। কেশুভাই পটেলদের মতো হেভিওয়েট নেতাদের বিদ্রোহ ছিল, বিজেপি’র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটা বড় অংশের অসহযোগিতা ছিল, ছিল সোনিয়া গান্ধী ও মনমোহন সিংহের মতো শীর্ষ কংগ্রেস নেতাদের তীব্র আক্রমণ। পাশাপাশি,

শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায়

ডানকুনিতে বিরাট জমি অধিগ্রহণ প্রকল্প

শঙ্কর দাস ও সুশান্ত বোস

এবার ডানকুনি। ‘শিল্পায়ন’, ‘উন্নয়ন’-এর নাম করে রাজ্যের ব্যাপক কৃষিজমি গ্রাস করার প্রকল্পে এবার বিপন্ন হতে চলেছে হুগলীর ডানকুনি সন্নিহিত কুড়িটি মৌজার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এখানে বসবাসকারী বেশ কয়েক হাজার মানুষের বাস্তু-ভিটা, জমি-জায়গা, রুটি-রুজি হারানোর আশংকায় এখন রাতের ঘুম উধাও হতে বসেছে। সরকার বিরোধী ক্ষোভ, লড়াইয়ের প্রস্তুতি আর আশা-আশংকার দীর্ণ এই জনপদে এক প্রতিবাদী মানবসত্ত্বার সাতরঙা ছবি ‘শ্রমিকশক্তি’ পত্রিকার তরফ থেকে আমরা সম্প্রতি তুলে আনলাম এই পত্রিকার পাঠকদের অবগতির জন্য।

ডানকুনির বুক চিরে চলে যাওয়া দুর্গাপুর এক্সপ্রেস রাস্তার দু’ধারে যত দূর চোখ যাবে তার রং শুধুই সবুজ। ‘ডানকুনি জমি বাঁচাও কমিটি’র আহ্বায়ক ডঃ অলীক আদক জানালেন- এই জমি উর্বর কৃষি অঞ্চল। নীচু জমি যে নেই তা নয়। তবে দীর্ঘদিনের চেষ্টায় সেই জমিকে মৎস্যচাষের উপযোগী হিসাবে গড়ে তুলেছেন মৎস্যচাষীরা। এছাড়া আছে বহু মুষের বাস্তুজমি, ঘরবাড়ি। আছে ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স, কোকাকোলার একটি বটলিং প্লান্ট সহ ছোট বড় বেশ কয়েকটি কারখানা। এখন এইসব কিছুর পাট তুলে দিয়ে এখানে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ফ্ল্যাট দিয়ে সাজানো এক উপনগরী গড়ে তোলা হবে— এই হলো মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ ভট্টাচার্যের নতুন বায়না। দেশের সর্ববৃহৎ নির্মাণ সংস্থা ডি.এল. এফ এবং কে.এম.ডি.এ-র যৌথ উদ্যোগে গড়ে তোলা এই প্রস্তাবিত উপনগরীর সব থেকে কম দামী ফ্ল্যাটটার দামই স্থির হয়েছে কুড়ি লক্ষ টাকা। চোখ কপালে উঠে গেলেও কিছু করার নেই। ‘এ সব আপনার জন্য লয় গো’। আপনি আপনার জমিটুকু ‘স্বেচ্ছায়’ দিন। পুনর্বাসন কলোনীর বস্তিতে থাকলে থাকুন। নয়তো কিছু খুদকুঁড়ো নিয়ে মানে মানে নিজের পথ দেখুন।

২০০৩ সালের ১০ জুন কলকাতা গেজেটে হুগলীর ৭৪টি মৌজায় জমি কেনা-বেচার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। ২০০৫ সালের ১৩ জুলাই এর মধ্যে ৫৪টি মৌজার ওপর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় প্রশাসন। বাকী কুড়িটি মৌজার মোট ৭৭৭১ একর জমির মধ্যে ৪৮৪০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে বলে ঘোষণা করে। এই কুড়িটি মৌজা চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার মধ্যে ব্যপ্ত রয়েছে। এই চারটির মধ্যে তিনটি পঞ্চায়েতই আবার বিরোধী রাজনৈতিক দলের হাতে। কুড়িটি মৌজার মধ্যে পাঁচটি মৌজা সম্পূর্ণভাবে এবং পনেরটি মৌজা আংশিকভাবে অধিগ্রহণ করা হবে। এই পাঁচটি মৌজার মধ্যে পড়েছে সেই সিঙ্গুরেরই আরও দুটি মৌজা, রাজ্যধরপুর, ডানকুনি এবং রিষড়ার একটি করে মৌজা। সরকারি পরিকল্পনা অনুসারে ৪৮৪০ একরের মধ্যে ৪০৬৯ একরে হবে উপনগরী আর ৭৭১ একর অঞ্চলে গড়ে তোলা হবে

শেষাংশ ৮ পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়
শ্রমিকশক্তি
৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী '০৮

পুঁজির পক্ষে সিপিএম-এর সওয়াল

পুঁজিবাদের পক্ষে জোরদার সওয়াল শুরু করেছেন সিপিএম নেতৃত্ব। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, জ্যোতি বসু, প্রকাশ কারাত কে নয়! পুঁজিবাদী রাজনৈতিক পথ তাঁরা অনেক আগেই গ্রহণ করেছেন কিন্তু পুঁজিবাদের পক্ষে, পুঁজির গুণকীর্তন করে শীর্ষ নেতৃত্বের এত খোলামেলা, এত ঘনঘন বিবৃতি আগে শোনা যায়নি। সিপিএম-এর সাধারণ কর্মী সমর্থকদের মনে যেন কোন ধোঁয়াশা না থাকে, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যেন কোন মোহ না থাকে, সেজন্যই একসঙ্গে সমস্ত শীর্ষ নেতারা বিবৃতি দেওয়া শুরু করেছেন। কখনও কখনও মিডিয়ার একাংশ বুদ্ধকে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে এক নিরপেক্ষ উন্নয়নমুখী ব্যক্তিত্ব হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করে থাকে। বুদ্ধ যখন গণআন্দোলনের চাপে ল্যাজে-গোবরে হতে থাকেন তখন আবার জ্যোতি বসুকে এরকম এক ব্যক্তিত্ব হিসাবে তুলে ধরা হয়ে থাকে। এই দুজনের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বিরোধের কথাও মাঝে মধ্যে বলবার চেষ্টা হয়ে থাকে। কিন্তু পুঁজির জয়গান গাইবার প্রশ্নে তাঁরা যে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, তা এই দুই নেতা তো বটেই এমনকী প্রকাশ কারাতও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। প্রকাশ কারাত তো আরএসপি-কে রীতিমতো বকাবকি করেছেন বেশি 'সমাজতন্ত্র'-'সমাজতন্ত্র' করার জন্য। তাঁর বক্তব্যটি এরকম— গত তিরিশ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকারে থেকে যখন পুঁজিবাদ করলে তখন সমাজতন্ত্রের কথা খেয়াল ছিল না, এখন যে বড় সমাজতন্ত্রের জন্য গলা ফাটাচ্ছে!

এদিকে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী ভি.এস অচ্যুতানন্দন আবার সমাজতন্ত্র নামক তকমাটি এখনই খুলে ফেলার পক্ষে নয়। তাঁর বক্তব্য, 'যারা পুঁজিবাদকে সমর্থন করছে তাদের অদূর ভবিষ্যতেই অনুতাপ করতে হবে। পুঁজিবাদের সুবিধা থেকে সঙ্কট ঢের বেশি। পার্টির মূল আদর্শ সমাজতন্ত্র। শ্রমিকশ্রেণীই পুঁজিবাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজাবে।'

অচ্যুতানন্দন যাই বলুন না কেন, যে উদ্দেশ্যেই বলে থাকুন না কেন, সিপিএম-নেতৃত্বের কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীতে আস্থা নেই। ওদের মা-বাপ এখন পুঁজিপতিরা। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা পশ্চিমবাংলার মানুষকে একটা বিষয় গেলানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তা হল পুঁজি ছাড়া আমাদের উন্নতি হবে না, কর্মসংস্থান হবে না, সুতরাং পুঁজির যোগান যারা দেবে সেই দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা আমাদের রক্ষাকর্তা প্রভু— তাদের জয়গান করো। ওদের যুক্তিবিন্যাসটা এরকম— দারিদ্র্য দূর করতে হলে উন্নয়ন করতে হবে, বেকারি দূর করতে হলে কর্মসংস্থান করতে হবে, তার জন্য চাই শিল্প, শিল্প করতে পুঁজি লাগবে, সরকারের পুঁজি নেই সুতরাং পুঁজির জন্য চাই পুঁজিপতি। সুতরাং পুঁজিবাদ ছাড়া আমাদের বাঁচার রাস্তা নাই।

কাস্তে হাতুড়ি আঁকা লালঝাণ্ডা ওড়ানো সিপিএম নেতাদের মুখে পুঁজি ও পুঁজিবাদের এমন জয়গান কারও কানে একটু বেমানান লাগতে পারে। কিন্তু আজকে সত্য হল বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা মুখ্যমন্ত্রীদের মুখে আপনি একই যুক্তি শুনবেন। এখানে নবীন পট্টনায়েক, নরেন্দ্র মোদি, বিলাসরাও দেশমুখ কিংবা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের যুক্তির মধ্যে বিশেষ কোনো ফারাক খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুঁজিবাদ এভাবেই তার মাহাত্ম্য প্রচার করে। রাজতন্ত্রে রাজারা নিজেদেরকে 'ঈশ্বরের সন্তান' বলে প্রচার করত। পরবর্তীকালে পুঁজিপতিরাও এভাবেই তাদের অনিবার্যতার কথা প্রচার করে এসেছে। বুদ্ধবাবুরা নতুন কিছু বলছেন না। পুঁজিবাদের সেই ছেঁড়া জুতোয় পা গলিয়েছেন মাত্র।

এদের এই যুক্তি যে কত অসার, কত চাতুরিতে ভরা, তা কাটমানি খাওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না থাকলে বা পার্টির প্রতি আনুগত্যে অন্ধ না হলে সহজেই বোঝা যায়। প্রথমত, পুঁজিবাদ যদি দারিদ্র্য বা বেকারি দূর করতে সক্ষম তাহলে পুঁজিবাদের মধ্যে থেকেই দারিদ্র্য সৃষ্টি হল কেন? এত বেকারে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে কেন? আসলে এগুলোই পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদ তার নিজের প্রয়োজনেই মজুত বেকার বাহিনী সৃষ্টি করে। যত দিন যাবে বেকারি তত বাড়বে বই কমবে না। উন্নয়নের নামে যে সমস্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে তাতে একদল মানুষ আরও ধনী হবেন, কিন্তু সমাজের বড়সংখ্যক মানুষ আরও বেশি বেশি দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবে যাবেন। যেভাবে সর্বত্র শ্রমিকদের মজুরি কমছে, স্থায়ী শ্রমিকের বদলে ঠিকা প্রথায় কাজ করানো হচ্ছে, মানুষের আয় যে দিনের পর দিন কমছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একদল মধ্যবিত্ত মানুষ পুঁজি ঢোকার এই প্রাথমিক পর্বে কিছুটা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু পুঁজি যখন ভাঁটার টানে ফিরতে শুরু করবে তখন তারাও খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে। যেমনটা আমরা আর্জেন্টিনায় দেখেছিলাম—কলেজশিক্ষক থেকে সরকারি কর্মচারী সবাই রাস্তায় থালা বাজিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। কালার টিভি থেকে ওয়াশিং মেশিন বিক্রি করার জন্য শহরের পথে লাইন লেগে আছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মেই এ সংকট ঘুরে ফিরে আসবে।

এসব কথা জ্যোতি বসুরা জানেন না তা নয়। কারণ মার্কস সাহেব তাঁর সারাজীবন ধরে এই পুঁজিবাদের সংকটের কথাই তো আবিষ্কার করে গেছেন। শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া যে দারিদ্র্য এবং বেকারি থেকে মুক্তি নেই এটাই তো মার্কসবাদের মূল কথা। আসলে জ্যোতি বসুরা জেনেশুনেই এ সমস্ত কথা বলছেন। দারিদ্র্য দূর করা, গরীব মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন বা বেকারি দূর করার মতো কোনো মৌলিক কর্মসূচী আজ সিপিএম-এর এজেন্ডার মধ্যে নেই, সমাজতন্ত্র তো দূর অস্ত।

সিপিএম-এর আজ একমাত্র কর্মসূচী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন-এর প্রক্রিয়াকে এরাজ্যে সার্বিকভাবে প্রয়োগ করা। বিপুল পরিমাণ পুঁজি আজ বিনিয়োগের জন্য বাজার খুঁজছে। সেজ গঠনের মাধ্যমে, বড় বড় জমি অধিগ্রহণ করে নানারকম ঘরবাড়ি, নার্সিং হোম, শপিং মল তৈরি করা, বড় বড় রাস্তা, উড়ালপুল ইত্যাদির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ পুঁজি এদেশে বিনিয়োগ হচ্ছে। এদেশের সস্তা শ্রম, বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে, এদেশের কৃষিভিত্তিক শিল্পের যেটুকু বুনিয়াদ আছে তাকে ধ্বংস করে দিয়ে এক ধরনের শিল্প, এক ধরনের উন্নয়ন হবে এবং বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ হবে। এটা বিশ্বায়নের কর্মসূচী। এটা দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী এক বিশেষ পরিকল্পনা। এর সাথে দেশের বা রাজ্যের দারিদ্র্য দূর করা, আপামর জনসাধারণের উন্নতি করা বা বেকারি দূর করার কোনো সম্পর্ক নেই।

সেই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের প্রকল্প রূপায়িত করতে, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করার জন্যই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, জ্যোতি বসু বা প্রকাশ কারাতরা পুঁজির ও পুঁজিবাদের জয়গান করছেন। পুঁজিপতিদের রক্ষাকর্তা হিসাবে তুলে ধরছেন। আর যাই হোক এর সাথে পশ্চিমবাংলার অগনিত শ্রমজীবী মানুষের, গরীব মানুষের স্বার্থের কোনো সম্পর্ক নেই।

সুশীল সমাজ, সিপিএম এবং কার্লমার্ক্স

শংকর দাস

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করে সিপিএমের জনবিরোধী এবং দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থবাহী নগ্ন স্বরূপ আগের থেকে অনেক বেশি করে সাধারণ মানুষের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর প্রতিক্রিয়ার বহু সাধারণ মানুষ শিক্ষক, বিজ্ঞানী, নাট্যকর্মী, বুদ্ধিজীবি বা অন্যান্য বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষ যারা সরাসরি কোনধরনের রাজনীতিতে যুক্ত বা রাজনৈতিক কর্মী নন, যাদের একসঙ্গে আজকাল সঠিকভাবেই হোক আর বেঠিকভাবেই হোক বলা হচ্ছে সুশীল সমাজ, তারা এর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন, সোচ্চার হয়েছেন, মিছিল করেছেন— এককথায় একটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং করছেন। আর সাথে সাথেই সমাজের এই অংশটির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে চলেছে সিপিএমের নেতারা, তাদের মুখপত্র 'গণশক্তি' পত্রিকা এবং তাদের দালাল কিছু সংবাদপত্র। কিছু প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবি আবার তাদের নানা কারণের যোগফলে সিপিএমের এই ঘৃণ্য ও বর্বর কাজের প্রতি সমর্থন জুগিয়েছেন এবং তাদেরই কোলে বসিয়ে সিপিএম— দ্যাখো, আমারটা সুশীল আর তোমারটা দুঃশীল, এই ধরনের একটা বালখিল্য আচরণও করে চলেছে। 'গণশক্তি'র পাতায় আমাদের ইতিমধ্যেই 'খয়েরি রঙের সুশীল সমাজ'-এর এক গল্প শুনিয়েছেন শ্রী জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। ইদানীং ঐ কাগজে কলম ধরেছেন তাদের আর এক তাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত মৃদুল দে মহাশয় (দুঃশীলকে সুশীল করার তত্ত্ব, ৩০/১২/০৭, গণশক্তি পত্রিকা)। তাত্ত্বিকতার বদলে প্রগাঢ় বাচালতার সঙ্গে তিনি আবার স্বয়ং কার্ল মার্কসকে ব্যবহার করার সাহস দেখিয়েছেন তার বক্তব্যের সমর্থনে। স্বাভাবিকভাবেই, আমাদের পক্ষেও এ বিষয়ে দু-চার কথা বলাটা একান্ত দরকারি হয়ে পড়েছে।

কিন্তু প্রথমত, মৃদুল দের কি দরকারটা পড়ল কার্ল মার্কসকে আবার ধুলো ঝেড়ে নামিয়ে আনার এবং নিজেদের স্বপক্ষে দাঁড় করানোর চেষ্টা করার? যদি মনে রাখি যে, পশ্চিমবঙ্গে এই অধুনাজাগ্রত সুশীল সমাজ বা নাগরিক সমাজের এক বড় অংশই দৃষ্টিভঙ্গীগতভাবে বামপন্থী তাহলে এই উদ্দেশ্যেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়। এই অংশটির বহু ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে বামফ্রন্টকে সমর্থন জুগিয়েছেন তাদের বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই। বামফ্রন্টকে ঘিরে তাদের এক বৃহৎ স্বপ্ন আজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে কারণ বামফ্রন্ট বামপন্থা ত্যাগ করলেও এরা মোটের ওপর তা করেননি। হিন্দুত্ববাদী বুদ্ধিজীবিদের যে মুখপাত্ররা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ওপর আস্থা রাখেন তাদের এক প্রতিনিধি শ্রী স্বপন দাশগুপ্তের চোখে তাই নাগরিক সমাজের উত্থান ব্যাপারটা দেখতে লেগেছে এই রকম- ''সংক্ষেপে, লাল পতাকাকে আক্রমণ করতে আরও জোরদার লাল পতাকা ওড়ানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।'' (আনন্দবাজার ৩১-১২-০৭, 'পৃথিবী কি গোল...?')। সুতরাং সমস্ত কুকীর্তির সমর্থন খুঁজতে চাওয়া হবে কার্ল মার্কসে এ জিনিস স্বাভাবিক। আমেরিকার জনমানসে যেমন 'গণতন্ত্র' শব্দটার প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ আছে। তাই ডেমোক্রেসী শব্দকে অজুহাত করেই সেখানে বুশের ডেমন (শয়তান) দুনিয়াজুড়ে ক্রেজী (উন্মত্ত) হয়ে ওঠে। ১৪ নভেম্বর কলকাতার মহামিছিলে এই কারণেই কি আমরা পোস্টার দেখলাম 'বুদ্ধ-বুশ এক হ্যয়—ভুলো মাৎ'? পাশাপাশি সিপিএমের নীচু তলায় এখনও একটা অংশ ইঁট-চুন-সিমেন্ট-এর ঠিকাদারিতে নিমজ্জিত না হয়ে মূলত বামপন্থী অবস্থানে আছে। তাই তাদের কাছেও নিজেদের অবস্থান যে মার্কসবাদ সম্মত তা প্রমাণ করাটা প্রয়োজনীয়। এছাড়াও মৃদুল দে-রা আর একটা কথা ভালই জানেন যে, তারা যার সেবাদাস সেই পুঁজির আসল সর্বনাশ লুকিয়ে রয়েছে মার্কসের হাতেই। তাই সমস্ত কুকীর্তির সাথে মার্কসের নাম জড়িয়ে দিয়ে তাঁকে কলুষিত করার চেষ্টাও তাদের কাছে সমান জরুরী।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সহ এই পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক-কৃষকের রক্তে যাদের হাত মাখামাখি সেই দঙ্গলটার এক পাণ্ডা শ্রীমৃদুল দে লিখেছেন, মানুষের 'গোটা ইতিহাসই হলো মানুষকে মানবিক করে তোলার প্রক্রিয়া'! ব্যাপারটা তো মজার তাই না? কথাটা সরাসরি মার্কস থেকে উদ্ধৃত করা না হলেও আমরা বুঝতে পারি যে তা ধার নেওয়া হয়েছে মার্কসের আলোচনা থেকে। কিন্তু যা মোটেই বুঝতে পারি না যে তা হল সিপিএম আবার কবে থেকে এই গুরুদায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিল? মানুষ তো মানবিক হয়ে ওঠে শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, ঠিক যাদের সমর্থনে দাঁড়াচ্ছে সিপিএম! মানুষ তো মানবিক হয়ে ওঠে তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের জোয়ারে যা সমস্ত শ্রেণীবিভক্ততাকে পৃথিবীর মাটি থেকে মুছে দিতে চায়— ঠিক যার বিরুদ্ধে পথে হাঁটছে সিপিএম! তাহলে গোটা ইতিহাসকে বাদ দিয়ে, এমনকি তার বিরুদ্ধে গিয়ে এখন সিপিএম-ই কি হয়ে উঠল মানবজাতির পরম শিক্ষক? আর হলোই বা যদি, যেভাবে তারা কৃষকদের জমি জবরদস্তি কেড়ে নিয়ে, লাঠি চালিয়ে, গুলি চালিয়ে, ধর্ষণ করে, দাগী দুষ্কৃতিদের জড়ো করে তাদের হাতে এস.এল.আর তুলে দিয়ে এক ব্যাপক হত্যালীলা সংঘটিত করেছে— এই কি তাদের 'মানুষকে মানবিক করে তোলার' প্রক্রিয়া? আর এই যদি হয় প্রক্রিয়া তাহলে তারা কি নিজেদেরও ঠিক এই প্রক্রিয়াতেই 'মানবিক' করে তুলছেন? নাকি, নিজেদের আজকাল আর ঠিক মানুষ বলে গণ্য করা যাচ্ছে না?

'সুশীল সমাজ, মুক্ত বাজার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বেশ পছন্দসই।' লিখেছেন মৃদুল দে। আরও লিখেছেন, 'সাম্রাজ্যবাদীদের, পুঁজিপতি গোষ্ঠীর নয়া উদারীকরণের প্রবক্তাদের বর্বর আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুও যে সমাধান সূত্রের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে তা হলো সুশীল সমাজ।' মজার বিষয় হলো এই কথাগুলোও খুব কিছু ভুল লেখেননি মৃদুলবাবু। সারা বিশ্বে দারিদ্র্য, অসাম্য, শোষণ, বঞ্চনা, গণতন্ত্রহত্যা, যুদ্ধ, রক্তপাত, হানাহানি এ সবকিছুই সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদেরই নিজের সৃষ্টি। আবার তারাই চায় এ সবকিছুর সমাধান হিসাবে মানুষ যেন সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদকে উচ্ছেদের কথা না ভাবে। সমাধান হিসাবে নাগরিক সমাজের নিষ্ফল প্রতিবাদের নিরাপদ ঘেরাটোপে যেন সীমিত থাকে প্রতিস্পর্ধী মানবসত্ত্বা- সাম্রাজ্যবাদ এটাই চায়। কিন্তু এ তো হলো গিয়ে সাম্রাজ্যবাদ কি চায় তার কথা। আর বাস্তবে কি ঘটছে? জমি অধিগ্রহণে জবরদস্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে বিজ্ঞানী-নাট্যকর্মীরা শেষপর্যন্ত দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত অসাম্য বঞ্চনার খোদ বীজটারই সামনে। রাজনীতিহীনতার গন্ধ গেলে থাকা 'সুশীল সমাজ' নামটিকে পরিত্যাগ করে তারা ক্রমশঃ গ্রহণ করছেন 'নাগরিক সমাজ' শব্দটিকে। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সামগ্রিক বিরোধিতা উত্তরোত্তর হয়ে উঠেছে নাগরিক সমাজের অ্যাজেন্ডা। আর সিপিএম আরও বেশি বেশি করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিরই পক্ষে। তার আগ্রাসনের পক্ষে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে রুটি-রুজি থেকে উচ্ছেদ করে তাদেরই হাতে সম্পদের বিপুল কেন্দ্রীভবন এবং তার ফলস্বরূপ অসাম্য, বঞ্চনা, হানাহানিকে আরও গভীর করে তোলার পক্ষে। আর ঠিক সেই জন্যেই না আমরা স্বপন দাশগুপ্তকে বলতে শুনি— ''বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দোষ, তিনি মার্কসবাদ-এর এই ভয়াবহ ক্যারিকেচার-এর বিরোধিতা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন ও উদ্যোগের সংস্কৃতি নির্মাণ করতে চেয়েছেন। নতুন যুগের ভোগবাদী সংস্কৃতি উঁচুতে আটকে না রেখে নিচুস্তরেও তা প্রবাহিত করতে চেয়েছেন।'' সিপিএম আর নাগরিক সমাজ— ঐতিহাসিকভাবে যার যা হয়ে উঠার কথা ছিল সেই ইতিহাসেরই ব্যঙ্গচক্রে তারা তাদের সেই স্থান বদল করে নিয়েছে, এই বাস্তবতা মৃদুল দে-রা আমাদের কাছে চেপে যেতে চাইছেন।

কিন্তু নাগরিক সমাজের এই পরিণতি মোটেও আপতিক কোন ঘটনা নয়। মার্কস এ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন তাঁর 'হোলি ফ্যামিলি' গ্রন্থে। তিনি দেখিয়েছিলেন নাগরিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত এক একজন ব্যক্তি নাগরিকরা তাদের নিজেদের যতই মুক্ত বা স্বাধীন ভাবুন না কেন— এই ভাবনা সবসময়েই বিরাজ করে শুধুমাত্র তাদের কল্পনায়। পরমাণু যেমন নিজেতেই সম্পূর্ণ তাই তার কাছে তার বাইরের জগৎটা অর্থহীন। নাগরিক সমাজের এক একজন ব্যক্তিমানুষ নিজেদের এমন পরমাণু ভাবার চেষ্টা করে কল্পনায়। আর বাস্তবে প্রতিনিয়ত তাদের এই চেষ্টা ধূলিসাৎ হয়ে যায়— 'নোংরা' রাজনীতি আর অর্থনীতির মতো বিষয়গুলির সঙ্গে সংঘর্ষে। তাই আর বাইরের জগৎ সম্পর্কে উদাসীন হতে চেয়েও নাগরিক সমাজ শেষপর্যন্ত তা হয়ে উঠতে পারে না। সুতরাং শ্রেণীসংগ্রামের ক্রমউত্থিত অভিঘাতে নাগরিক সমাজের একটা অংশ যে শেষপর্যন্ত শোষিত মানুষের পক্ষে একটা অবস্থান নেয় সে বিষয়ে মার্কস সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। কিন্তু পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতা থেকে যে শোষণ, বঞ্চনা, অসাম্য, দারিদ্র্য, হানাহানির দীর্ঘকালীন প্রবহমানতা শক্তিসংগ্রহ করে, টিঁকে থাকে তার সমাধান হিসাবে তিনি কখনই নাগরিক সমাজ-এর সীমাবদ্ধতায় আটকে যাননি। আর ঠিক এইখানেই উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে তার ফারাক। শ্রেণিবিভক্ততাতে অটুট রেখে নাগরিক সমাজ গঠনের প্রকল্প থেকে সমাজগতি যে এগিয়ে যাচ্ছে আরও বহু দূরে, শ্রেণীসংঘাতের সংঘর্ষময় পথ অতিক্রম করে শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে— এই সত্য মার্কস প্রমাণ করেছিলেন। এই ঘটনার নাম তিনি দিয়েছিলেন, বহু পথ ঘুরে মানুষের আবার তার নিজের কাছেই ফিরে আসা। তাই ফয়েরবাখের দর্শন নিয়ে আলোচনার দশ নম্বর থিসিসে তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন— ''পুরনো বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ হলো 'নাগরিক' সমাজ; নতুন বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ হলো মানবসমাজ বা সমাজীকৃত মানবজাতি।''

ঐতিহাসিক কারণেই দুনিয়া জুড়ে অগ্রণী শ্রমিকরা মার্কসেরই ভাবশিষ্য। সমাধানসূত্র হিসাবে নাগরিক সমাজের সীমাবদ্ধতা কিন্তু বাস্তব সংগ্রামে তার কার্যকরী ভূমিকা আর মৃদুল দে-দের শয়তানি কোন কিছুই তাদের চোখ এড়িয়ে যাবে না। 'মার্কসবাদী' সি পি এমের আসল দুর্ভাগ্য সম্ভবত এটাই!

অর্থনৈতিক উন্নতি ও কর্মসংস্থান : একটি বিতর্ক

দ্বিতীয় পর্ব

চন্দন দেবনাথ

এখন আমরা আলোচনা করব অর্থনীতিবিদ অমিত ভাদুরীর সদ্য প্রকাশিত একটি বই নিয়ে। ইংরেজিতে প্রকাশিত বইটির নাম বাংলা করলে দাঁড়ায় এরকম: ''মর্যাদা সহ উন্নয়ন: পূর্ণ নিয়োগের পক্ষে একটি সওয়াল।'' লম্বা নামটুকু পড়েই আন্দাজ করা যায় যে, উন্নয়নের বর্তমান মডেলটিই তাঁর সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু, কারণ তা সমস্ত কর্মক্ষমকে কাজ দিতে অক্ষম। এক্ষেত্রে অন্যান্য সমালোচকদের মতো ভাদুরীও মনে করেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এদেশে উচ্চহারে আর্থিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও তা যথেষ্ট পরিমাণে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি। আর এই না পারার কারণ হল, তাঁর মতে, জিডিপি'র এই বৃদ্ধি ঘটছে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুবাদেই; জিডিপি যে হারে বাড়ছে, উৎপাদন-শীলতাও যদি প্রায় সেই হারে বেড়ে চলে, কাজের সুযোগ বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় প্রায় শূন্য। কীভাবে মিটবে তাহলে এই সমস্যা?

ভাদুড়ীর মত, এর জন্য চাই দুটো মোটা দাগের নীতি অবলম্বন করা। প্রথমত, রপ্তানি বাড়ানোর পথে নয়, দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার ঘটানোর মধ্য দিয়েই জিডিপি বৃদ্ধির হার বাড়াতে হবে। আর দ্বিতীয়ত, উৎপাদনশীলতাকে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শিখতে হবে। কেবল উৎপাদন খরচ কমানোর কৌশল হিসাবে দেখলে চলবে না। তবে দেশের বাইরের বাজার ধরায় জোর থাকলে এভাবে দেখাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের গুরুত্বকে যদি স্বীকার করা হয়, উৎপাদনশীলতা সম্পর্কিত চালু কর্পোরেট যুক্তিটা আর কিন্তু খাটে না। এই যুক্তিতে ভাদুরী প্রস্তাবিত উন্নয়নের ''বিকল্প মডেলে''-এর মূল কথা হল ''আমাদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা-সক্ষমতার উন্নতি ঘটাতে খরচ কমানো আর মজুরিতে লাগাম পড়ানোর চিন্তায় আবদ্ধ থাকার বদলে আমাদের মুখোমুখি হতে হবে এই সমস্যার, কীভাবে এক প্রসারমান আভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি করা যায়।'' এটাই ভাদুরীর বিবেচনায় হল ''কেন্দ্রীয় প্রশ্ন''।

এই অভিমতকে প্রতিষ্ঠা করতে বেশ জোরের সাথে ভাদুরী একথাও বলেন যে, একের পর এক নির্বাচনে তথাকথিত ''শাইনিং ইন্ডিয়া'' মডেল প্রত্যাখ্যাত হবার পর উন্নয়নের এই ''বিকল্প মডেল'' অনুসরণ ক'রে চলার সাহস এবার দেখানো উচিত। এবং এই ''বিকল্প মডেল''-এ ''স্বাভাবিক প্রথম পদক্ষেপ'' হবে, আইনত স্বীকৃত একটা ন্যূনতম মজুরিতে সবাইকেই উৎপাদনশীল নিয়োগের অফার দেওয়া। এ ব্যাপারে সম্ভাব্য সংশয় পোষণকারীদের উদ্দেশে এটাও তিনি বলেন যে, এটা একটা অবাস্তব প্রস্তাব কারণ তা বাস্তবায়িত করার মতো আর্থিক সামর্থ্য সরকারের নেই, এমন যুক্তিতে তিনি আদৌ বিশ্বাসী নন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, সদিচ্ছা থাকলে সরকার এটা করতেই পারে, যদি না **আর্থিক দায়দায়িত্ব ও বাজেট পরিচালনা আইন** জাতীয় আইন প্রণয়ন দ্বারা সরকার স্বেচ্ছায় নিজের হাত বেঁধে রাখে।

ভাদুরীর বিচারে, আই এম এফ আর ফিনান্স বাজারকে খুশি করা ছাড়া এই বিশেষ আইনটি প্রণয়ন করে কোনও লাভই হয়নি, বরং আমরা হারিয়েছি সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে সবার জন্য উৎপাদন শীল নিয়োগের কর্মসূচিকে ফিনান্স করার কার্যকরী এক উপায়। তাই তাঁর মত, সব থেকে ভাল হত যদি আইনটিকে বাতিল করা যেত। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি তা সম্ভব না-ও হয়, তবুও রাস্তা আছে অন্যভাবে টাকা ধার করে এমন কর্মসূচি হাতে নেবার। যাই হোক, আন্তর্জাতিক স্তরে অপ্রচলিত ধারার অর্থনীতিবিদ রূপে খ্যাত অমিত ভাদুরীর মূল পরামর্শ হল ''আগে বৃদ্ধি, তার পরে পূর্ণ নিয়োগ'', এই চিন্তা ত্যাগ করে এখন সরকারি নীতি হওয়া উচিত ঠিক উল্টো- ''আগে নিয়োগ আর তারই ফলে বৃদ্ধি।''

এখন প্রশ্ন হল, এই প্রস্তাবটিকে আমরা দেখবো কীভাবে। প্রথম দর্শনে কারও মনে হতেই পারে, এটা একটা অবাস্তব প্রস্তাব। কোনও সরকারই এতে কান দেবে না। কিন্তু এভাবে দেখলে মনে হয় ভুলই হবে। কারণ, এটাও তো ঘটনা যে, **জাতীয় গ্রামীণ কর্মস্থান নিশ্চয়তা আইন** নামে একটা আইন কিন্তু দেশে এখন আছে। তবে আরও অনেকের মতো ভাদুরীও, স্বভাবতই, এই আইনটিকে অনেক দিক থেকেই যথেষ্ট বলে মনে করেন না। কিন্তু তবুও তিনি এটা মনে করেন যে, একটা ''পূর্ণ নিয়োগ সম্পন্ন সমাজ''-এর দিকে এগোনোর ক্ষেত্রে এই আইনটিও, আর কিছু না হলেও, একটা আইনী পরিসর অন্তত জোগায়; এর সাথে যুক্ত হওয়া দরকার, প্রকল্পের ফাইনান্সিং ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রশ্নে সরকারি স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা আদায়ের এক যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা। ভাদুরীর নিজস্ব প্রস্তাবটির পরিসর অবশ্য আরও অনেক বড়। গ্রামভারত শুধু নয়, এতে থাকবে দেশের সবার জন্যে উৎপাদনশীল নিয়োগের অফার— আইনত স্বীকৃত ন্যূনতম মজুরিতে। এই অফার গ্রহণে ইচ্ছুক কেউ আপীল করলেই সরকার কাজ দিতে আইনত বাধ্য থাকবে। প্রস্তাবটিকে আমরা কি তাহলে স্বাগত জানাবো? এটা ঠিক করার আগে আমাদের কিন্তু বুঝে নেওয়া উচিত যে, এই প্রস্তাব মোতাবেক আগামী দিনে আদৌ কোনও আইন গৃহীত হবে কিনা, বা হলেও সরকার তা ঠিক মতো মেনে চলবে কিনা, অথবা সদিচ্ছা থাকলেও সরকারের আর্থিক সামর্থ্য থাকবে কিনা, এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে যদি ঘাঁটাঘাটি করা হয়, তাহলে কিন্তু প্রথমেই প্রস্তাবটির প্রতি একভাবে নৈতিক সমর্থন জুগিয়ে দেওয়া হয়। পাঠক আশা করি বুঝে নিয়েছেন যে, প্রস্তাবিত এই সবার জন্য উৎপাদনশীল নিয়োগের অফার কিন্তু চালু উৎপাদন ক্ষেত্রে বা কাজের জায়গা গুলোতে নয়। এই বাইরেই সরকারকে 'কাজের ব্যবস্থা' করতে হবে। প্রশ্ন এখানেই: ''পূর্ণ নিয়োগ সম্পন্ন'' (বা বেকারবিহীন) সমাজ গঠনের জন্য সরকারকে আলাদা ক'রে 'কাজের ব্যবস্থা' করতে হবে কেন?

এই সাদামাটা প্রশ্নটার জবাব কি আমরা অমিত ভাদুরীর মতো অর্থনীতিবিদের কাছে দাবি করতে পারি না? কিন্তু মুশকিল হল, এমন 'সাদামাটা প্রশ্ন' আজকাল করতেই প্রায় আমরা ভুলে গিছে। খোঁচাখুঁচি করি অন্যসব দিক নিয়ে। যেন বা ওগুলোই আসল প্রশ্ন। ফলে সমস্যার প্রকৃত কারণটাই যায় চাপা পড়ে। এই রেওয়াজটা থেকে প্রথমে বেরোনো দরকার। কেন আমরাও এভাবে ভাববো যে, দেশের সমস্ত কর্মক্ষমকে 'কাজ দেবার' মতো 'যথেষ্ট কাজের জায়গা' এই মুহূর্তে নেই? এই ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া মানে কিন্তু বুদ্ধবাবুর যুক্তিতেই সায় দেওয়া যে, তাঁর নয়া 'শিল্পায়ন' উদ্যোগ এ রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যেই। বস্তুত, এই কর্মসংস্থান সৃষ্টির ধারণাটাকেই প্রথমে প্রশ্ন করা উচিত। কারণ, উৎপাদনক্ষেত্রের আয়তন তো আর 'কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা'দিয়ে নির্ধারিত হয় না। নির্ধারিত হয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সমসাময়িক চাহিদার দ্বারা। এটা তো কালনিরপেক্ষ একটা সত্য। আর উৎপাদনের জন্য চাই মানুষের উৎপাদনশীল শ্রম। এটাও কালনিরপেক্ষ একটা সত্য। তাহলে চালু উৎপাদন-ক্ষেত্রেই সমস্ত কর্মক্ষমের 'নিয়োগ' সম্ভব নয় কেন? কেন কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা বলতে হবে? চালু কোনও শিল্পে একশ' জনের বদলে দু'শ জন কাজ করলে ক্ষতি কী? এ তো জানা কথা যে, এমন দাবি 'নিয়োগকারীদের' কাছে হাস্যকর বলেই মনে হবে— তাদের মজুরি বাবদ 'খরচ-খরচা' ও মুনাফা সংক্রান্ত হিসাবের চিন্তা থেকে। কিন্তু ঐ চিন্তা দ্বারা আমরা কেন চালিত হব?

অমি ভাদুরীর 'বিকল্প মডেল' এসব প্রশ্নকে বাস্তবত আড়ালই করেছে। অথচ তিনিই আবার বলেছেন, শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে ''ভিন্ন দৃষ্টিকোণ'' থেকে দেখতে শিখতে হবে। তবে কেমন হওয়া উচিত সেই ''ভিন্ন দৃষ্টিকোণ'' তা কিন্তু স্পষ্ট করেননি। শুধু এটাই বলেছেন যে, বিদেশের বাজার ধরার তাড়ায় উৎপাদন খরচ কমাতে গিয়ে উৎপাদন-শীলতা এত উঁচু জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যে ''কাজের সুযোগ'' তেমন বাড়ছে না। কিন্তু এ কথায় উৎপাদনশীলতা সম্পর্কিত ''ভিন্ন দৃষ্টিকোণ''-এর আভাস তো পাওয়া গেল না। এই নীরবতা কেন? উৎপাদনশীলতা বাড়লে কাজের সুযোগে টান পড়বে, এটাও কাল নিরপেক্ষ সত্য নাকি? তাই যদি হয়, তাহলে তো উৎপাদশীলতায় লাগাম পরিয়ে রাখতে হয়। মজার ব্যাপার হল, এমনটাও আবার তিনি বলতে পারছেন না। এ এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। আসলে সোজাসাপটা পুঁজিবিরোধী অবস্থান না নিতে পারলে এমনটাই হয়। অথচ সহজেই কল্পনা করা যায় যে, সমাজ জুড়ে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়লে উৎপাদন কার্যে মানুষকে আগের চাইতে অনেক কম সময় দিলেই চলে, যার সুবাদে মানুষ তার অন্যান্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কাজকর্মের চাহিদা পূরণের অধিকতর সময় পায়, ফলে সমাজ উন্নত হয়। এটাই প্রকৃত উন্নয়ন, এভাবে ভাববো এবং ভাবাবো না কেন?

হ্যাঁ এটা ঠিক যে, পুঁজির প্রভুত্ব বজায় রেখে এ জিনিস সম্ভব নয়। কারণ, পুঁজির চোখে মানুষের শ্রমক্ষমতা তো স্রেফ উৎপাদনের আবশ্যিক শর্তমাত্র নয়, আসলে তা হল মুনাফা তৈরির যন্ত্র মাত্র। একই কারণে, সমস্ত কর্মক্ষম মানুষ সামাজিক উৎপাদন কর্মে যুক্ত থাকবে, এমন কোনও তাগিদও তার নেই। তাই, সবার জন্য 'কাজের ব্যবস্থায়' যদি বা কখনও সায় জানাতেও হয়, মজুরি ও কাজের শর্তাবলী কেমন হবে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। সুতরাং অমিত ভাদুরীর প্রস্তাব আজ না হলেও কাল গৃহীত হতেই পারে। প্রশ্ন হল, ''মর্যাদা সহ উন্নয়ন''-এর নামে এহেন প্রস্তাবে আমরা নৈতিক মদত জোগাবো কিনা।

ন্যানোয় মজেছে সিপিএম

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

আমরা তা জানি। আমরা অদ্ভুত মজার সাথে লক্ষ্য করলাম কিভাবে সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিতর্কের মূল প্রশ্ন থেকে প্রশ্নটা সরে গেল অন্য জায়গায়। অন্যায়ভাবে জোর করে জমি অধিগ্রহণ, ১৮৯৪-এর ঔপনিবেশিক জমি অধিগ্রহণ আইন, শিল্প হলে কোথায়, কাদের জন্য—এসব নিয়ে যে বিতর্কটা চলছিল সেটা আচমকা উবে গেল, পড়ে থাকলো শুধু একটা প্রশ্ন, লাখ টাকায় গাড়ি কি সম্ভব ছিল? যেন সম্ভব হলেই তাপসী মালিককে খুন-ধর্ষণ করা যায়, রাজকুমার ভুলকে হত্যা করা যায়, সিঙ্গুরে একের পর এক আত্মহত্যা মেনে নেওয়া যায়, বাজমেলে-খাসেরভেড়ি- বেড়াবেড়ির হাজার হাজার কৃষকের জমি অম্লান বদনে দিয়ে দেওয়া যায়, কাজ হারানো দোর্বাদির ক্ষেতমজুরদের নিরন্ন দিনগুলোকে সয়ে নেওয়া যায় হাসিমুখে!

টাটা কিংবা টাটার মত অন্য সব মালিকদের প্রতিটা হাসি আমাদের, মেহনতী মানুষের কান্নার ইতিবৃত্ত রচনা করে, আমাদের শোষণের নতুন ব্লুপ্রিন্ট তৈরী করে। যখন দেখি সে হাসিতে উদ্বেলিত জনতাও, তখন বুঝি কিভাবে মালিকীরাজের এই জমানায় মেহনতী মানুষের মুক্তির দর্শনের উঠে দাঁড়ানোর বদলে এখনও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মালিকী চেতনা, মালিকদের কান্না-হাঁসির দোলায় এখনও দুলছে সমাজ।

সমাজের অনেকে না হয় দুললো, শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করে তোলা ছাড়া এর আর কোনও প্রতিকার নেই— কিন্তু এভাবে টাটার হাওয়ায় লাগবে নাচন সিপিএমের ডালে ডালে! পুঁজিবাদ করবে বলে খুল্লামখুল্লা ঘোষণা করেছে দলটা, দেশ-বিদেশের পুঁজিপতিদের কাছে গ্রীন সিগনাল পাঠিয়েছে, মেরেধরে-ধর্ষণ করে পুঁজির চারণভূমি তৈরী করেছে... এসব তো চলছিলোই... নতুন সংযোজন সিপিএমের ইংরেজী মুখপত্র পিপলস ডেমোক্রেসীতে (জানুয়ারী ২০, '০৮, পৃঃ ৬) 'টাটা ন্যানো'র জয়গান গেয়ে 'টাটা ন্যানো : ইজ স্মল বিউটিফুল' নামে লেখাটা। সস্তায় জীবনদায়ী ওষুধ নয়, খাদ্য-সংকটের সমাধানের কোনও সূত্র নয়, কৃষকের জন্য রাসায়নিক সার-কীটনাশকের বিকল্প কোনও পথ নয়, এখানে 'বিজ্ঞান ও প্রগতি' কলামে আলোচিত হয়েছে রতন টাটার ন্যানো। সত্যি, রতনে রতন চেনে!

টাটা ন্যানো নিয়ে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত যেসব প্রশ্ন উঠে এসেছে, যে কথাগুলো এসেছে শহরের রাস্তায় গাড়ির আধিক্য-যানজট নিয়ে, জ্বালানী তেলের সংকট নিয়ে— সেবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এ লেখার বিষয় নয়। বিতর্কগুলোর সবকটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তা নিয়ে অন্য কোনও পরিসরে আলোচনা হওয়া উচিত। আলোচনা হওয়া উচিত যেভাবে একলাখি গাড়ির স্বপ্ন নির্মাণ করা হয়েছে, তা নিয়েও। মারুতির ছোট গাড়ি আজ তার শুরুর দামের পাঁচগুণ দামে পৌঁছেছে। অতঃপর টাটার ন্যানো কতদিন এই দামে থাকবে তাও কারোর গবেষণার উপজীব্য হতে পারে। কিন্তু পিপিলস ডেমোক্রেসীর লেখা পড়তে গিয়ে সেসব তো দূরে থাক, মনে হচ্ছিলো টাটা ন্যানোর বিজ্ঞাপন পড়ছি, কত গুণ ঐ ছোট্ট গাড়ি আর সেই গাড়ির জন্মদাতার। পড়লে মনেই হবে আপনার, আহা! এমন গাড়ি একটা না থাকলে আর ইহজীবনের মানে কি?

বলা হয়েছে, ঐ গাড়ি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-এ সিঙ্গুরে বার্ষিক আড়াই লাখ থেকে ক্রমাগ্রয়ে বার্ষিক দশ লাখে নিয়ে যাওয়া হবে; অতঃপর সমর্থন দিতে হবে আমাদের। বলা হয়েছে যে শুধু 'বড় মানুষ মোটর কেন চড়বে?', গরীব সেই মোটরের তলায় চাপা না পড়ে এক লাখ টাকা দিয়ে সেই গাড়িতেই চড়বে। সিপিএমের মুখপত্রে পাতার পর পাতা টাটা ন্যানোর বিজ্ঞাপন এভাবে দিব্যি চলছিলো... হঠাৎ বুঝি তাদের মনে পড়েছে যে তারা তো মুখে অন্ততঃ নিজেদের কম্যুনিস্ট পার্টি হিসেবে দাবী করে। অতঃপর শেষ পাতে এসে অশ্বত্থামা হত ইতি গজ-র মত উল্লেখ রয়েছে যে এই এক লাখ টাকা ভারতের মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের তিনগুন, ভারতের অর্ধেক মানুষ এখনও ক্ষুধার্ত অবস্থায়ই ঘুমোতে যায়। এই তো! আমাদের প্রশ্ন তো এটুকুই, এই যে বার্ষিক দশলাখ গাড়ি উৎপাদন হবে, সেই উৎপাদনে কাজ পাবে কতজন? কারাই বা কিনবে সেই গাড়ি?

সাবেক জমানা থেকে এটাই তো প্রশ্ন থেকেছে পুঁজিবাদকে ঘিরে। এই ব্যবস্থা কি সবার হাতে কাজ, সবার পেটে ভাত, সবার জন্য বেঁচে থাকার রসদ দিতে পারে? উত্তরটা জানা। জানা বলেই শ্রেণীসংগ্রামের পথের কথা সেই করে থেকেই আলোর পথে যাত্রার দিশা হয়ে থেকেছে। উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর তাই সিপিএমের পক্ষে আর উচ্চারণ করা সম্ভব নয়, কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে পড়বে তাহলে। তাদের দলীয় সম্মেলনেও তো সাবধানবাণী এসেছে যে কর্মসংস্থানের বুলি যেন এই ধারনা না তৈরী করে যে সবার কাজ মিলবে। তাদের এই সাবধানতা অবশ্য একারণে নয় যে পুঁজিবাদ সম্পর্কে মোহগ্রস্ততা রখতে হবে বলে, বরং এ তাদের দলীয় নেতাদের বেকার যুব সমর্থকদের হাত থেকে বাঁচানোর রক্ষাকবচ মাত্র।

পদ্মভূষণ রতন টাটা সুকান্তর ভাইপোর মুখরক্ষার জন্য যতই ছোটলোকের একলাখি মোটরগাড়ি গড়ে দিন, লড়াইটা চলবেই। মালিকদের পক্ষ নিয়ে যতই সাফাই গান, টাটার ন্যানো নিয়ে যতই লাফালাফি করুন, তাপসীদের জীবনের মূল্য, হাজার হাজার নিরন্ন কৃষকের জমির মূল্য আমাদের কাছে অমূল্যই থাকবে। কোনও একলাখি গাড়ি দিয়ে সে লড়াই আর স্বপ্নকে কিনে নেওয়া যায় না। যেতোই যদি তবে ইতিহাসে বারবার নুরুল ইসলাম - আনন্দ হাইত - তাপসী মালিক-শেখ সেলিমরা ফিরে ফিরে আসতো না।

ভোটসর্বস্ব জোট নাকি লড়াইয়ের ঐক্য

শর্মিষ্ঠা চৌধুরী

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমিরক্ষার আন্দোলন শাসকশ্রেণীর অনেক হিসেবনিকেশকে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ-নির্দেশিত শিল্পনীতি প্রবর্তনে 'সেজ' গঠনের জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে তা বিধানসভায় ২৩৫টি আসন জেতা বামফ্রন্ট সরকার স্বপ্নেও ভাবেনি। 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'—এই মনমোহনী স্লোগানের জাদু, ২৩৫-এর পেশীবল ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অপূর্ব সমন্বয়ে খুব সহজেই টাটা-সালেমদের হাতে কাঙ্ক্ষিত জমি তুলে দিতে পারবে বলে আশা করেছিল সিপিএম তথা বামফ্রন্ট সরকার। বাধ সাধল কৃষক সমাজ, যার একটা বড় অংশ আবার এতদিন সিপিএম সহ বামফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলগুলির ছত্রছায়াতেই ছিল। তারপরের ঘটনাবলী সকলেরই জানা। সিঙ্গুরে শেষ অবধি জমি কেড়ে নিতে পারলেও ধূলিসাৎ হল বামফ্রন্টের বিশ্বাসযোগ্যতা। নন্দীগ্রামে সরকারকে প্রত্যাহার করতে হল জমি অধিগ্রহণ ও 'সেজ' গঠন প্রকল্প। রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে মেহনতী মানুষের এই অসম লড়াইয়ে রক্ত ঝরল অনেক, বহু প্রাণ গেল, কিন্তু নতুনভাবে প্রমাণিত হল সেই পুরনো কথাটা—শেষ কথা বলে জনগণ, শাসকশ্রেণী নয়।

বস্তুত সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের গণ-আন্দোলন, গত কয়েক বছর ধরে যে আপাত স্থিতাবস্থা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, তা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। শুধুমাত্র সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লড়াইয়ের সমর্থনেই মানুষ পথে নেমেছে তা নয়, এই লড়াইয়ের প্রেরণায় সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক বিন্যাসের বিরুদ্ধে এক নতুন ধরনের সক্রিয়তাও লক্ষ করা যাচ্ছে— যার উদাহরণ গণবন্টন ব্যবস্থায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও মধ্যবিত্ত মানুষের আন্দোলন বা রিজওয়ান উর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিভিন্ন ভাবে সোচ্চার হওয়া। সাধারণ মানুষের এই সক্রিয়তা যেমন রাজ্যজুড়ে গণ আন্দোলনের অনুকূল বাতাবরণ তৈরি করেছে, তেমনই শাসকশ্রেণীর মধ্যেকার বিভিন্ন অংশকে বাধ্য করেছে লড়াইয়ের ময়দানে প্রতিবাদী ভূমিকা রাখতে। শাসকশ্রেণীর যে অংশটি বর্তমানে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নয়, তারা চেষ্টা করেছে আন্দোলনের রাশ নিজেদের হাতে তুলে নিতে। আবার গণআন্দোলনের চাপে ক্ষমতায় আসীন বামফ্রন্টের কিছু অংশও সরকারের অগণতান্ত্রিকতার সমালোচনা করেছে, সরকারের বিশেষভাবে নির্মম পদক্ষেপগুলি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে।

কিন্তু জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তা একটা অনির্দিষ্ট সময় ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে না। সবসময়ই এই সক্রিয়তা একটা দিশা খোঁজে। সংগ্রামী শক্তির যথাযথ নেতৃত্বে তাই এই সক্রিয়তা যেমন গণআন্দোলনের উন্নত পর্যায়ে রূপান্তরিত হতে পারে, তেমনই ময়দানে সক্ষম সংগ্রামী শক্তির অভাব এই সক্রিয়তাকে ঠেলে দেয় শাসকশ্রেণীরই কোনো না কোনো দলের শরণে। যেহেতু শাসকশ্রেণীর রাজনীতি সাধারণভাবে সংগ্রামবিমুখ, তাই স্বাভাবিকভাবেই সংসদীয় বিরোধীপক্ষ জনগণের সক্রিয়তাকে প্রধানত নির্বাচনী সংগ্রামের দিশায় পরিচালিত করে নিষ্ক্রিয়তায় পর্যবসিত করে। সংসদীয় বিরোধী পক্ষের সুচতুর শিক্ষকতায় জনগণ বোঝে অধিকার অর্জনের লড়াই মানে ক্ষমতাসীন দলের বদলে শাসনক্ষমতার বাইরে থাকা দলকে ভোটে জেতানো।

রাজ্য রাজনীতিতেও দেখা যাচ্ছে এই প্রক্রিয়ারই প্রতিফলন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম যেভাবে মানুষকে রাস্তায় নামিয়েছিল, এবং ফলস্বরূপ এই আন্দোলনগুলি যে উচ্চতায় পৌঁছানোর সম্ভাবনাসম্পন্ন ছিল, সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে জমি অধিগ্রহণ ও 'সেজ' গঠন সংক্রান্ত নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য করতে পারত, সেই সম্ভাবনার ধারেকাছেও পৌঁছালো না। একই বছরে দু'দুটো নারকীয় গণহত্যায় ক্রুদ্ধ, স্তম্ভিত মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক মহামিছিলে পা মেলালেন ঠিকই, কিন্তু এ ধরনের অজস্র মিছিলে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের শ্বাসরোধ করার কর্মসূচীর বদলে সামনে পেলেন 'ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের' কর্মসূচী। দীর্ঘদিনের নিথরতা কাটিয়ে যাঁরা পথে নেমেছিলেন, তাঁদের এক অংশ এই কর্মসূচীর যথার্থতা সম্পর্কে প্রভূত সংশয় নিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন। আরেক অংশ তাঁদের যাবতীয় লড়াইমনস্কতা নিয়েই পা দিলেন শাসকশ্রেণীর চেনা ফাঁদে—এক সরকারের বদলে আরেক সরকার, হয়তো এমন এক সরকার যে জনগণের বিরোধিতাকে উস্কে না দিয়েই মালিক-শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে।

এরই ধারাবাহিকতায়, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লড়াইয়ের ফসল হিসেবে জাগ্রত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণচেতনাকে বিকশিত করার পরিবর্তে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছে সিপিএম-বিরোধী জোটগঠনের তৎপরতা। এই জোট গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল, সিপিএম-এর পক্ষে না সিপিএম-র বিরুদ্ধে—সমাজে এই মেরুকরণ ঘটানো যাতে করে জনগণ তার সংগ্রামী আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করার জন্য তৃতীয় কোনো বিকল্প খুঁজতে না যায়। এর মধ্যে অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে গত ৩০শে ডিসেম্বর গঠিত ১৭ দলের 'প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'। 'বামফ্রন্টের বিকল্প' এই ফ্রন্টের ঘোষিত লক্ষ্যই হল সিপিএম-কে হঠানো। এই লক্ষ্যে কংগ্রেস-বিজেপিকে শরিক করতেও এই ফ্রন্টের আপত্তি নেই, যদিও এই দুটি দল এখনো ফ্রন্টে যোগদান করেনি। বুঝতে অসুবিধে হয় না, কেন সিপিএম-এর মতো মার্কসের দোহাই পেড়ে সাম্রাজ্যবাদের দালালি করা দলও বিরোধী জোটকে 'নীতিহীন' আখ্যা দিয়ে এখনো কিছু হাততালি কুড়োতে সক্ষম হয়। গত দু'বছরে জমি অধিগ্রহণ-বিরোধী লড়াইয়ে কংগ্রেস বা বিজেপিকে কখনই মাঠে ময়দানে লড়তে দেখা যায়নি। কংগ্রেস কেন্দ্রে সরকার চালাচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রতিটি নীতি রূপায়ণে সে কাণ্ডারীর ভূমিকায়। নয়া অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তন থেকে 'সেজ' আইন প্রণয়ন, সবই তার নেতৃত্বে হয়েছে।' ৪৭ পরবর্তী দশকগুলিতে অসংখ্য গণআন্দোলন পুলিশ দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব তার। বিজেপি তার সাম্রাজ্যবাদের প্রতি সীমাহীন আনুগত্যের প্রমাণ কেন্দ্র সরকারে থাকাকালীন বারেবারে দিয়েছে এবং এখনো গুজরাট, রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলিতে— যেগুলি আবার সংখ্যালঘু নিধন, কৃষকদের ওপর গুলিচালনার জন্য কুখ্যাত— দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান পর্যায়ে এ রাজ্যে তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ থেকেছে সিপিএম-এর সমালোচনা বা বলা ভাল কম্যুনিজমের সমালোচনার মধ্যে। ফলে কংগ্রেস-বিজেপিকে নিয়ে জোট গঠনের চিন্তা যে মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল, তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু কংগ্রেস-বিজেপির অনুপস্থিতিতে এই জোটের চরিত্র আপাতত কীরকম? আমরা জানি, এ জোটের প্রধান শক্তি তৃণমূল কংগ্রেস নিজেকে 'আসল কংগ্রেস' বলে দাবি করে এবং সে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটেরও শরিক। তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কর্মসূচীতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার বা নিদেনপক্ষে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর কোনো ঘোষণা নেই। কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে আমরা দেখেছি, সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম, রিজওয়ান কাণ্ড বা রেশন কেলেঙ্কারি— সর্বত্রই তৃণমূল লড়াইয়ের ময়দানে নিজের বাস্তব উপস্থিতি জাহির করতে সচেষ্ট হয়েছে। (কংগ্রেস-বিজেপির তুলনায় তৃণমূল এক্ষেত্রে একটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে কারণ এই দলটি ভারতবর্ষের কোথাওই শাসন-ক্ষমতায় না থাকার ফলে এর পিছুটান কম, জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতাও বেশি।) জনগণও একটা সংসদে প্রতিনিধি থাকা দলকে সঙ্গে পেয়ে লড়াইয়ের রাশ তার হাতে তুলে দিয়েছে এই আশা নিয়ে যে সরকারি নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সংসদীয় বিরোধী পক্ষই সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস এই আন্দোলনের অভিমুখকে সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির বিরোধিতা থেকে নিছক সিপিএম বিরোধিতার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ফলে তৃণমূল নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে 'সেজ' আইন বাতিল করার জন্য বা সাম্রাজ্যবাদ-নির্দেশিত 'উন্নয়নের' কর্মসূচী বাতিল করার জন্য মেহনতী মানুষের স্বার্থবাহী কী কী পদক্ষেপ নেবে বা গণআন্দোলনের বিকাশে কী ভূমিকা রাখবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। কিন্তু কংগ্রেস-বিজেপির জন্য দ্বার খোলা রেখে এই ফ্রন্ট শাসকশ্রেণির নীতির সঙ্গে নিজেদের নৈকট্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে।

জোট প্রসঙ্গে আলোচনায় জমিয়তে নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত ছোটখাটো ৯টি দলের 'পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'-এর কথায় আসা যাক। সম্প্রতি তসলিমা নাসরিনের ভিসা বাতিলের দাবিতে জমিয়তের উগ্র সক্রিয়তা আমরা দেখেছি। ফলে তাদের নেতৃত্বে কোনো জোট পশ্চিমবঙ্গবাসীকে কতটা গণতন্ত্র উপহার দিতে পারে তা নিয়ে যে কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই যথেষ্ট সংশয় থাকবে। এই জোটের ঘোষিত লক্ষ্য হল 'বামফ্রন্টের ৩০ বছরের অপশাসনের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করা।' এর উপায় হিসেবে 'পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যন্ত এই জোটের কর্মসূচীকে ব্যাপকভাবে প্রচার' করতে হবে যাতে করে 'আসন সমঝোতার প্রশ্নে বাম-অবাম সহ সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে' এবং 'বিরোধী ভোটের বিভাজন যথাসম্ভব আটকানো যায়'। জোটের ঘোষণাপত্রে যদিও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ও সমাজজুড়ে তার ধ্বংসাত্মক প্রভাবের বিরোধিতা করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী করা হয়েছে 'সিপিআইএম-এর মতো সুবিন্যস্ত গঠন কাঠামোর একটি দলের শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু' হওয়াটাকে। একই কারণে নাকি সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ঘটেছে বা চীনে ভ্রষ্টাচার আকাশচুম্বী হয়েছে! ফলে এই জোটের লড়াইটা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নাকি সিপিএম-এর গঠন কাঠামোর বিরুদ্ধে তা বোঝা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। বিজেপিকে জোট শরিক করার ব্যাপারে ঘোষণাপত্রে মৌনতা অবলম্বন করা হয়েছে, কংগ্রেস-তৃণমূলের জোট শরিক হওয়ার সম্ভাবনাকে বাতিল না করেও কিছু সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। ঘোষণাপত্রে পরস্পরবিরোধী কথার ঠাসবুনোট থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয় যে এই জোট আর যাই হোক লড়াইয়ের কোনো জোট নয়, শাসকশ্রেণীর নীতির বিকল্প কোনো নীতি এর দিশা নয়, আসন্ন পঞ্চায়েতে নির্বাচনে সিপিএম-এর বিরুদ্ধে ১ ১ লড়াইটাই এর লক্ষ্য মোক্ষ। বলাই বাহুল্য, সিপিএম-কে হারানো এই জোটের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই যাদের পক্ষে সিপিএম-কে হারানো অন্তত খাতায় কলমে সম্ভব, তাদের সাহায্য করাতেই এই জোটের ভূমিকা সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। তাই-ই বোধহয় স্বতন্ত্র লড়াইয়ের কর্মসূচীও এদের নেই।

নীতিহীন জোট রাজনীতির যদি এটি একটি পিঠ হয়, তবে নিঃসন্দেহে উল্টো পিঠটা হল সরকারের গতি আঁকড়ে পড়ে থেকেও সেই সরকারের বিরুদ্ধে তর্জনগর্জন করা। দেখা যাচ্ছে এতে বিশেষ দক্ষ আরএসপি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক। সিপিএম তথা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যত এরা সুর চড়ায় ততই আরো বেশি বেশি করে সরকারে নিজেদের স্থান মজবুত করার মরিয়া চেষ্টা চালায়। যে কোনো মুহূর্তে সরকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারি— এরকম ভাবভঙ্গী দেখিয়ে বিরোধী শক্তির একটা অংশের আনুগত্য নিশ্চিত করে, অপরদিকে ওদের দেখিয়ে বামফ্রন্টের মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে নিজেদের জায়গাটাকেই আরো পাকাপোক্ত করে।

স্পষ্টতই, বামফ্রন্ট হটানোর জোট ও বামফ্রন্টকে রক্ষা করার জোট— এই দুইয়ের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে মেহনতী মানুষের স্বার্থ। দানা বেঁধেছে এক রাজনৈতিক শূন্যতা। একদিকে সংসদীয় বিরোধীপক্ষ সহ একটা অংশ জনগণের সক্রিয়তাকে ভোটদানের সক্রিয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে নির্বাচনী বৈতরণী পার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আর অন্যদিকে সংগ্রামী বামশক্তি বলে যারা পরিচিত, তাদের চূড়ান্ত অসংগঠিত অবস্থা জনগণের স্বাভাবিক সিপিএম-বিরোধী আকাঙ্ক্ষাকে জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী উপায়ে ধারণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে সংগ্রামী বামেদের একটা অংশ তৃণমূলের জোটে সামিল হচ্ছে, তো আরেকটা অংশ সিদ্দিকুল্লার জোটে। আবার কোনো অংশ আরএসপি-ফরওয়ার্ড ব্লকের ওপর গভীর ভরসা রেখে 'বিকল্প বামফ্রন্ট' গঠনের স্বপ্ন দেখছে, তো কোনো অংশ আজকের বিশেষ পরিস্থিতিতেও বিশ বছর আগেকার পুরনো লাইন প্রয়োগে নিয়ে যাওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা সক্রিয়তা আবার ধীরে ধীরে অস্তমিত হতে চলেছে।

সংগ্রামী বাম ধারা হল সেই ধারা যারা সংসদীয় সংগ্রামকে সংসদ বহির্ভূত সংগ্রামের অধীনস্থ হিসেবে দেখে। নির্বাচনী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে মাঠে ময়দানের সংগ্রামকে আরো বিকশিত করার জন্য ও সেই বিকশিত সংগ্রামের পক্ষে জনগণের রায়কে সংগঠিত করার জন্য। শাসকশ্রেণীর দলগুলোর সাথে এখানেই সংগ্রামী বামেদের মূল পার্থক্য। আজকের পরিস্থিতিতে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সংগ্রামী বামেদের নতুনভাবে সংগঠিত হতে হবে। এই ন্যূনতম জায়গা থেকেই চালাতে হবে ঐক্যবদ্ধ ক্রিয়াকলাপ, বিচ্ছিন্নতা টানতে হবে শাসকশ্রেণীর দলগুলির সাথে।

গত দু-এক বছরে মানুষ যেভাবে পথে নেমেছে, সেখান থেকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের প্রতিটা নতুন আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণকে ব্যাপকভাবে সংগঠিত করার অনুকূল বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। 'সেজ' গঠন থেকে খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ— দেশের সার্বভৌমত্বকে বন্ধক রাখার প্রতিটা পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিরোধ গড়ে তোলার বাস্তবতা জন্ম নিচ্ছে। তৈরি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিকল্প দেশগঠনের নীতিকে সমাজ জুড়ে প্রচারে নিয়ে গিয়ে উচ্ছেদ-কর্মসংকোচন-বেসরকারিকরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিপুল জনমত গঠন করার বাস্তব সম্ভাবনা। এই অবস্থায় শাসকশ্রেণীর দলগুলির বিপরীতে, শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করে তুলতে দায়বদ্ধ, এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী বাম শক্তির জোরালো রাজনৈতিক উপস্থিতিই পারে জনগণের সংগ্রামকে শতধা বিকশিত করতে। বামফ্রন্টের স্বৈরতান্ত্রিক, জনবিরোধী শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে। দিকে দিকে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনগুলিকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে সজোরে ধাক্কা দিতে। এবং সর্বোপরি জনগণের সক্রিয়তাকে ধ্বংস করার শাসকশ্রেণীর দুই কৌশলকে— ক্ষমতাসীন দলের দ্বারা দমন করা ও ক্ষমতার বাইরের দলের দ্বারা নির্বাচনী সংগ্রামে বিলীন করা— পর্যুদস্ত করে প্রকৃত জনগণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে।

পানীয় জল দূষণ—উৎসের সন্ধানে

সুশান্ত বোস

উত্তর চব্বিশ পরগণার কামারহাটি জুট মিলের শ্রমিক পরিবারে গত ১১ই ডিসেম্বর একই দিনে দেড় বছরের দুই শিশু এবং ১২ বছরের এক বালকের মৃত্যু হয়। শ্রমিকদের অভিযোগ মিল থেকে যে জল সরবরাহ করা হয় সেই জল খেয়ে এই দুর্ঘটনা। প্রায় ২০০ বছরের পুরানো পাইপের কোনো সংস্কার না হওয়াই এই মৃত্যুর জন্য দায়ী। এরজন্য মিল কর্তৃপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁরা জানান, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সাপ্লাইয়ের জলের মান অতি নিম্ন। তাঁরা অনেকে বাধ্য হয়ে এই জলই রান্না-খাওয়ার জন্য ব্যবহার করেন। এলাকায় প্রায় সবাই পেটের রোগে ভোগে। গত ১০-১১ ডিসেম্বর ৫০ জনেরও বেশি স্থানীয় বাসিন্দা বমি, পেটব্যথা, পাতলা দাস্ত হওয়ায় স্থানীয় সাগর দত্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়। কামারহাটি ইউনিক ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি শামিম আখতার জানান, বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবি নিয়ে মিল কর্তৃপক্ষের কাছে গেলে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অজুহাতে শ্রমিকদের কাজ থেকে বসিয়ে দেয়। ফলে তাঁরাও আর কিছু বলতে পারেন না। তবে ১১ তারিখের ঘটনার পরে কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পাইপের সংস্কার হবে। যদিও এখনও পর্যন্ত (৩১-১২-২০০৭) কোনো কাজ শুরু হয়নি।

পাঠক পাঠিকাগণ, আসুন এবার পানীয় জল নিয়ে ভারতবর্ষের সামগ্রিক চিত্রটা একবার দেখে নেওয়া যাক। কেরালার প্লাচিমাদা থেকে রাজস্থানের কালাদেরা, তামিলনাডুর গঙ্গৈকোণ্ডন থেকে উত্তর প্রদেশের মেহদিগঞ্জ, মহারাষ্ট্রের থানে থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের খাম্মাম— ভারতে এরকম অসংখ্য গ্রাম আছে যেখানে একপাত্র নির্মল পানীয় জল পাওয়া রীতিমত কঠিন। অন্ধ্রের নাল্লামাড়ায় পানীয় জল বলে গ্রামবাসীরা যা পান করেন (করতে বাধ্য হন) তার রং বাদামী, পরিং

কার দেখতে পাবেন, অস্বচ্ছ তরলের ওপর কীসব যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। বরং এক বোতল কোকাকোলা এখানে অনেক সহজে পাওয়া যায় (মাত্র পাঁচ টাকায়, আমির খানের বিজ্ঞাপন মনে পড়ে?)। মুম্বাইতে যে সমস্ত বেসরকারি থিম পার্ক, অ্যাকোয়াটিকা আর ওয়াটার পার্ক আছে, সেখানে প্রতিদিন ৫০০০ কোটি লিটারের ওপর জল ব্যবহৃত হয়। আর অন্যদিকে শহরের বস্তিবাসী মেয়েরা ২০ লিটার জলের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কলকাতাতেও অ্যাকোয়াটিকার মতো জলকেলি-উদ্যানের পাশাপাশি সহাবস্থান করছে শ্রমিক বস্তিগুলোয় পানীয় জল ও পরিষ্কার বাথরুমের নিদারুণ অভাব। ২০০৫ সালের রিপোর্ট— খরাক্রান্ত বিদর্ভের গ্রাম বাজারগাঁওয়ে মাত্র একটি সরকারি কুয়ো আছে। দশদিন পরে পরে সেখানে এক গাড়ি করে জল আসে। অথচ এখানেই রয়েছে এক দৈত্যাকার 'ফান এন্ড ফুড ভিলেজ', বড়লোকদের জন্য তৈরি এক প্রমোদকানন। সেখানে প্রায় ১৮ রকমের জল ক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে, লক্ষ-লক্ষ লিটার জল লাগে সেখানে। বাজারগাঁওয়ের সমস্ত জল সেই দিকে ধেয়ে যায়। তামিলনাডুর থোট্টিপাল-য়মের মাত্র কয়েকটা বাড়িতেই জল-সংযোগ আছে। যাদের এই 'বিলাসিতা' ভোগ করার উপায় আছে, তারাও ১৫ দিনে একবার জল পায়।

একদিকে শ্রমজীবী মানুষের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল যেমন দুর্লভ হয়ে উঠছে, অন্যদিকে তা কর্পোরেট সংস্থাগুলোর কাছে মুনাফাযোগ্য পণ্যে পরিণত হয়েছে। হাজার খানেকেরও বেশি বোতল জলের উৎপাদক (পার্লে-বিসলারি, কোকা-কোলা, পেপসিকো, পার্লে অ্যাগ্রো ইত্যাদি) সহ ভারতের বোতল জল শিল্প আন্তর্জাতিক নিরিখেও রীতিমত বড়। এই বোতল জল শিল্পেও উত্থান শুরু হয় ১৯৯১ সালে, মনমোহনীয় উদারিকরণের হাত ধরে।

কর্পোরেট সংস্থাগুলো জলের জন্য নির্ভর করে ভূগর্ভ-জলের ওপর। বেসরকারি সংস্থাগুলো কী মূল্যে এই জল কেনে? জয়পুরের কাছে খরাক্রান্ত

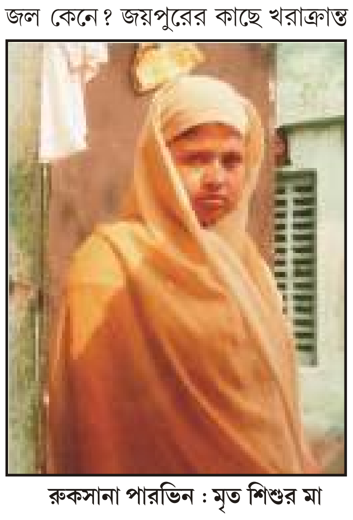

রুকসানা পারভিন : মৃত শিশুর মা

কালাদেরায় কোকা-কোলার বোতল কারখানার কথাই ধরা যাক। কোকা-কোলা সেখানে জল প্রায় বিনামূল্যেই পায়। তারা প্রতিদিন জল তোলে প্রায় ৫ লক্ষ লিটার, প্রতি ১০০০ লিটার পিছু ১৪ পয়সা দরে। কিন্তু অন্য দেশে জল এত সস্তা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (কোকা-কোলা আর পেপসিকোর জন্মভূমি) শিল্প কারখানায় ব্যবহারের জন্য ১০০০ লিটার জলের দাম ১৯৯০ সালের শেষদিকেই ছিল গড়ে প্রায় ২১ টাকা, গ্রেট ব্রিটেনে প্রায় ৯০ টাকা, আর কানাডায় ৭৬ টাকা। ফলে এমন সস্তায় কাঁচামাল পেলে বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলো কেন আমাদের দেশে ছুটে আসবে না? (বিভিন্ন রাজ্য সরকার একেই 'শিল্পায়ন', 'উন্নয়ন' বলে রাজ্যবাসীদের ঘুম পাড়িয়ে রাখছে।) আর আমাদের দেশের ভূগর্ভ জল সংক্রান্ত আইন বহুজাতিক সংস্থাগুলোর কাছে যথেষ্ট লোভনীয়। আইনে আছে, ''জমির মালিকই জমির নীচের ভূগর্ভ-জলেরও মালিক।'' অর্থাৎ যে কেউই তাহলে এক বর্গমিটার জমি কিনে চারপাশের সমস্ত জল একা টেনে নিতে পারে, এবং আইন এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না। (সাধে কি আর বলে, আইনের হাত-পা বাধা, তবে তা কাদের কাছে, পাঠক-পাঠিকারা ভেবে দেখবেন।) এবং বাস্তবে কর্পোরেট সংস্থাগুলো করছেও তাই। জয়পুরের খরাক্রান্ত কালাদেরার কথাতো ওপরেই বলা হয়েছে আরেকটা তথ্য দেখুন, ভারতে বোতল কারখানাগুলো সব রয়েছে দক্ষিণে। মোট ১২০০ বোতল কারখানার মধ্যে ৬০০ আছে শুধু তামিলনাড়ুতে; আর দক্ষিণ ভারতে, বিশেষত তামিলনাড়ুতে, জলাভাব প্রচণ্ড।

এমতাবস্থায় স্বাধীন দেশের স্বাধীন কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলো কী করছে? ভারতে যে জল বিপর্যয় নেমে আসছে তার মোকাবিলায় কীরকম উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে? বাস্তবটা হল, এদেশের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলো জলকে বেসরকারি করার উদ্যোগ নিয়েছে। কিছু নমুনা— ছত্তিশগড়ের শিউনাথ নদী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, মহারাষ্ট্রে একটা গোটা শহরের জল সরবরাহ বেসরকারি সংস্থার হাতে। উড়িষ্যা সরকার ২০০৪ সালের রাজ্যের চূড়ান্ত জলনীতির খসড়ায় বেসরকারিকরণের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। দিল্লিতে ২০০৫-এর গ্রীষ্মে যে তীব্র জলসংকটের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেক পরিকল্পনার খবর ফাঁস হয়ে যায়। জানা যায়, রাজ্য সরকার, দিল্লি জল বোর্ড ও বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছিল যার মূল বক্তব্য ছিল দিল্লির জলসরবরাহ ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ। গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রচার এবং জনতার চাপে রাজ্য সরকার সেই প্রকল্প থেকে পিছিয়ে আসে। ২০০২ সালে কেরালার সাংসদ বীরেন্দ্রকুমার বিদেশে সফর করার সময় এক আমেরিকান দৈনিকে প্রকাশিত এক টেন্ডার নোটিশ দেখে জানতে পারেন, তাঁর জন্মভূমি কেরালার মলমপুজা নদী ও বাঁধ বেসরকারি সংস্থার কাছে ইজারা বা বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ স্থানীয় কোনো খবরের কাগজে কোনো বিজ্ঞপ্তি বেরোয়নি। অন্ধ্রপ্রদেশে এ জিনিস আগেই শুরু হয়েছিল। চন্দ্রবাবু নাইডু যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন জল বেসরকারি করার অভিপ্রায়ে তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ সেচ উন্নয়ন নিগম-এর কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলেন। এর মানে হল, এবার জল যার-যার, তার-তার। মানে, রাজ্যে অসংখ্য কুয়ো খোঁড়ো আর যে যার সামর্থ্য মত জল নাও, জল বেসরকারিকরণের প্রথম ধাপ।

ভারত নদীমাতৃক দেশ, এখনও প্রায় ৫০ লক্ষের বেশি পরিবার (কানাডার মোট জনসংখ্যার সমান) পুকুর, সরোবর, নদী বা ঝরনা থেকে জল সংগ্রহ করে, মোট বাড়ির ৬২ শতাংশে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। দেশের জনস্বাস্থ্য সমস্যার অধিকাংশই জল থেকে জাত বা জলঘটিত রোগের সঙ্গে যুক্ত (যার উদাহরণ দিয়েই এ লেখা শুরু হয়েছে), শুধু উদরাময়েই এখানে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়। এমন দেশে জলকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিলে কী ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা সহজেই অনুমেয়। ইতিমধ্যেই পানীয় ও সেচের জলের ওপর নিয়ন্ত্রণ বড় বড় সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার ভূমিকা হিসেবে রাজ্যে রাজ্যে নতুন করে আইন লেখার কাজ শুরু হয়েছে। কর্পোরেট সংস্থাগুলো প্রতিদিন ভূগর্ভ থেকে লক্ষ লক্ষ লিটার জল তুলে নিচ্ছে আর অন্যদিকে পানীয় জলের সমস্যা দেশের বিভিন্ন অংশে চরম আকার নিচ্ছে, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাওয়ায় (এও ছয়ের দশকের 'সবুজ বিপ্লবের মারাত্মক কুফল) মাঠের পর মাঠ জলের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে, টিউবওয়েলের জলে আর্সেনিকের সংযোজন ঘটছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ছুড্রুখগ্ন রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মোট আটটি জেলা আর্সেনিকে আক্রান্ত।

তাহলে দেশের নীতিপ্রণয়নকারী মন্ত্রী ও আমলারা জলকে বেসরকারি হাতে তুলে দেবার জন্য এত উদগ্রীব কেন? আসলে বিস্তর টাকার খেলা আছে এতে। একদিকে সমাজের গরীব লোকের দুর্ভোগ বাড়ছে, অন্যদিকে মস্ত লাভ হচ্ছে সরকারি আমলা আর বেসরকারি সংস্থার। প্রকৃতির আলো, বাতাসের মতো জলের অধিকার সমাজের সর্বস্তরের মানুষের এক মানবিক এবং অবশ্যই মৌলিক অধিকার— এই বক্তব্যের সাথে একমত হতে আমার-আপনার হয়ত এক মিনিটও সময় লাগবে না কিন্তু মেক্সিকো শহরে ২০০৬ সালের মার্চে চতুর্থ বিশ্ব জলবৈঠকে (খেয়াল করুন, চতুর্থ) ১২০টা দেশের সম্মিলন নিরাপদ ও পরিষ্কার পানীয় জলের অধিকারকে মানবিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেবার সর্বসম্মতিতে পৌঁছতে পারেনি। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ মেক্সিকোর ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ফোরামের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল Coca-Cola কোম্পানি। জলের ওপর মানুষের জন্মগত অধিকার অন্তত খাতায়-কলমে প্রতিষ্ঠিত হলে সমস্যায় পড়বে কোকা-কোলার মতো নরম পানীয় কোম্পানি। তাই এ ব্যাপারে তারা অত্যন্ত সজাগ। একইভাবে, আজকের দিনে বিশ্বের জল, জমি, সহ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদই পুঁজির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হচ্ছে। পুঁজির এই শৃঙ্খলকে চূর্ণ করেই মানুষ পারবে প্রকৃতির সঙ্গে তার স্বাভাবিক সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করতে।

তথ্যসূত্র: ফ্রন্টলাইন, ২১ এপ্রিল, ২০০৬; লাভের জল, লোভের জল: পি সাইনাথ ও অন্যান্য (মনফকিরা)

সিঙ্গুর এবং হাইকোর্টের রায়

বিশেষ প্রতিবেদন : ১৮ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্ট তার রায়ে বলেছে সিঙ্গুরে টাটাদের ছোট কারখানার জন্য যে জমি অধিগ্রহণ হয়েছে তা বৈধ। প্রধান বিচারপতি সুরিন্দর নিজ্জর ও বিচারপতি পিনাকি ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিল— সিঙ্গুরে টাটার কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণে আইন মেনেই হয়েছে। ১৮৯৪ সালে ভারতের ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার ভারতের কৃষিজীবি জনতার হাত থেকে জমি কেড়ে নেবার জন্য যে কুখ্যাত আইন প্রনয়ণ করেছিল, আজকের 'গরীব মানুষের পার্টি' সিপিএম পরিচালিত 'জনদরদী' রাজ্য সরকার নিখুঁতভাবে সেই আইন প্রনয়ণ করেছে এই রায়ের মধ্য দিয়ে তা আবারও পরিষ্কার হলো। এই রায় অপ্রত্যাশিত ছিলো না। এর আগে হাইকোর্ট সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলন নিয়ে যতগুলি রায় দিয়েছে তার প্রত্যেকটিতে পুলিশ এবং ক্যাডার বাহিনীর অত্যাচার, গুলি চালনা, হত্যা প্রভৃতিকে প্রশ্ন করা হয়েছে— অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু জমি অধিগ্রহণের মূল কাঠামোটিকে কখনই আঘাত করা হয়নি। সাধারণভাবে বললে এক অত্যাচারিশাসনব্যবস্থা এবং বিশেষভাবে ১৮৯৪-এর আইনটির বৈধতাকে কখনই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করানো হয়নি। দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের রক্ষাকারী হিসাবে রাজ্য সরকার যেভাবে 'জনস্বার্থ' কথাটিকে জনগণেরই বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে চলেছে তা সহজেই আদালতের

বিচারে ছাড় পেয়ে গেছে। আদালত এ-বিষেয়েও কোনো প্রশ্ন তোলেনি। আদালতের আমরা কাছে তা আশাও করি না। আর ঠিক এই জায়গাটিতেই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের পরিষ্কার বোঝাবুঝির অভাব দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন আবার বলা হচ্ছে 'সুপ্রীম কোর্টে আমরা জিতবই'। আন্দোলনের গোটা ভবিষ্যত বাজী রাখা হচ্ছে শকুনির সঙ্গে পাশা খেলায়!

সিঙ্গুরের ক্ষতিগ্রস্ত বহু মানুষ এখনও ক্ষতিপূরণের চেক নেননি। আত্মসমর্পণ না করে সর্বস্ব পণ করে তাঁরা এখনও দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই জারী রেখেছেন। একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী দেশব্যাপী গরীব মানুষের লড়াইয়ের কাছে এটি একটি অভয়মন্ত্র হিসেবে বিরাজ করবে। পাশাপাশি আন্দোলনের নেতৃত্বের ভারতের অত্যাচারী রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করার ব্যর্থতা, আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের ওপর নির্ভর করার বদলে কোনো তৃতীয় পক্ষের ওপর (আদালতই হোক আর কেন্দ্রীয় সরকারই হোক) নির্ভর করার অবিমৃশ্যকারীতাও ইতিহাসে রয়ে যাবে। মেহনতী মানুষের লড়াই প্রতিটি জয়কে সংহত করে, প্রতিটি পরাজয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তাই ফিনিক্স পাখির মতো নিজের ভস্মাবশেষ থেকে তা আবার আকাশে উড়ে যাবার ক্ষমতা রাখে। সিঙ্গুরই তার ব্যতিক্রম হবে না।

গণশক্তির ভন্ডামি

বিশেষ প্রতিবেদন: রাজ্যজুড়ে মানুষের কাছে সিপিএম-এর শিল্পায়ন নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল যে এত বন্ধ কারখানা পড়ে থাকতে সেই কারখানার জমি না নিয়ে কৃষিজমিতে শিল্প করার দিকেই ছোটা হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে জেরবার হয়ে যাচ্ছেন বুদ্ধবাবু, তাঁর শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা 'BIFR-এ মামলা চলছে তাই জমি পাওয়া যাবে না', 'বন্ধ কারখানার জমি নিতে অনেক আইনি জটিলতা রয়েছে', 'মালিক ছাড়তে চাইছে না', প্রভৃতি বিভিন্ন কথা বলে কৃষিজমি নেওয়ার যৌক্তিকতাকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এর সবগুলোই মোটামুটি ধাপ্পাবাজি বলে প্রমাণ হয়ে গেছে, কারণ আঐউছ-এর কাছে কারখানা চালু করার জন্য বা সেই জমিতে নতুন শিল্প করার জন্য সরকার জমি চেয়েছে কিন্তু জমি পায়নি -- এরকম ঘটনা একটাও দেখাতে পারেননি শিল্প মন্ত্রী। তাই তাঁদের ভন্ডামির কৌশল অবলম্বন করা ছাড়া রাস্তা থাকে না।

এই ভন্ডামিরই একটি নমুনা হল ১১ই জানুয়ারি 'গণশক্তি'র পাতায় 'শিল্প গড়তে কেন্দ্র দেবে না বন্ধ বস্ত্র কারখানার জমিও' শিরোনামের একটি রিপোর্ট। শিরোনামটি পড়ে মনে হবে বুদ্ধবাবুরা কেন্দ্রের কাছে জমি নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু কেন্দ্র জমি ছাড়ে নি। কিন্তু মূল রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে অন্য চিত্র। সেই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, যে মিলগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের চালানোর সিদ্ধান্ত রয়েছে সেই মিলগুলোর জমি চেয়ে নিরূপম সেন চিঠি দিয়েছিলেন। যেমন এন.জে.এম.সির (রাষ্ট্রীয় জুট মিলগুলো) কারখানাগুলো। পশ্চিমবঙ্গে পাঁচটা জুট মিল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সংস্থা ন্যাশনাল জুট ম্যানুফ্যাকচার্স কর্পোরেশনের দ্বারা পরিচালিত। সেই মিলগুলোতে উৎপাদন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। দুটি মিল (খড়দহ ও কিনিসন) চালানোর সিদ্ধান্ত সরকার ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে ও বাকি মিলগুলি আঐউছ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলবে বলে স্থির হয়েছে। সেই মিলগুলোতে দ্রুত উৎপাদন শুরু করার দাবি না জানিয়ে শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেই মিলগুলোর জমি রাজ্য সরকারকে দিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছে। একইভাবে এনটিসি পরিচালিত কটন মিলগুলোর অনেকগুলিই সরকারের চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই মিলগুলোকেও দ্রুত চালু করার দাবি রাজ্য সরকার একবারের জন্যও করেনি। তার বদলে এই সমস্ত মিলগুলোর জমি চেয়ে নিরুপম সেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী শঙ্কর সিং বাঘেলাকে চিঠি দিয়েছিলেন। বাঘেলা তার উত্তরে বলেছেন যে এনটিসি ও এনজেএমসির মিলগুলোর কয়েকটিকে কেন্দ্র সরকার চালাবে। বাকি মিলের জমি নিলামে বিক্রি করা হবে। রাজ্য সরকার যদি নিলামে কিনে নেয় তবে সেই জমি পাওয়া যেতে পারে। এর অর্থ নিশ্চয়ই দাঁড়ায় না যে কেন্দ্র বন্ধ কারখানার জমি রাজ্য সরকারকে দিতে চায়নি। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য চক্রান্ত আছে ঠিকই কিন্তু তার মানে এই নয় যে বন্ধ কারখানার জমি রাজ্য সরকার পেতে পারে না, বা রাজ্য সরকার যে শিল্পপতিকে ডেকে নিয়ে আসতে চাইছে তারা সেই জমি পেতে পারে না। সেই জমি যদি টাটা কারখানা তৈরি করার জন্য কিনে নেন তবে তিনি সেই জমি পেতেই পারেন। আসল কথা হল, নিলামে দাম চড়বে, সেই দাম দিতে শিল্পপতিরা রাজি হবে না। শিল্পপতিরা চায় মুফতে জমি পেতে। গণশক্তির কথা থেকেও সেটাই বেরিয়ে এসেছে। সেখানে লেখা হচ্ছে, "ঐ জমিগুলি রাজ্য সরকার নিতে চাইলে তা নিতে হবে সর্বোচ্চ দামেই। যা কার্যত অসম্ভব। কারণ ঐ জমি নিলেও তা বরাদ্দ করা হবে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী সংস্থাগুলিকে।" তাদের কথা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে এখানে বন্ধ কারখানার জমি যদি কোনও শিল্প সংস্থা সর্বোচ্চ দামে কিনতে চায় তবে সেই জমি তাঁরা পেতে পারে। বন্ধ কারখানার জমি পাওয়া যাবে না বলে 'গণশক্তি' এতদিন যে প্রচার করে আসছিল তা ঠিক নয়। আসলে যে দাম দিতে হবে সেই দাম দিতে শিল্পপতিরা রাজি নয় এটাই হল ঘটনা। তাই এতদিন ধরে যে মিথ্যাচার তাঁরা করে আসছিলেন সেটা প্রকাশিত হয়ে গেছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও ফাঁস হয়ে গেছে যে বন্ধ কারখানা খোলার জন্য সরকারের ওপর চাপ দেওয়া রাজ্য সরকারের কোনও এ্যাজেন্ডাই নয়। কারখানাগুলোর জমি পাওয়া ও সেই জমি চড়া দামে বিক্রি করাটাই হল তাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে ঢাকতে গিয়ে 'গণশক্তি'র ভন্ডামিটা ধরা পড়ে গেছে। সেই ভন্ডামি ঢাকার জন্যই লেখাটির শিরোনাম এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে আসল সত্যটা চাপা পড়ে যায়।

দেশী বীজ, কৃষিপ্রযুক্তি ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রচারের লক্ষ্যে

বলাগড়ে কৃষিবিজ্ঞান মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বলাগড় গণবিজ্ঞান সমিতির উদ্যোগে গত ২৬-২৭ শে জানুয়ারী হুগলীর জিরাট কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত হল কৃষিবিজ্ঞান মেলা ২০০৮। মেলাস্থল নামাঙ্কিত হয় ডঃ আর.এইচ.রিচারিয়া নগর ও ডঃ শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চ হিসেবে। এই বিজ্ঞানমেলায় বহু বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে রাসায়নিক সারের সাহায্যে চাষের কুফল ও জৈব চাষের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা ও প্রদর্শনী চললো দুদিন ধরে।

প্রথমদিন বাংলার ধানবৈচিত্র্য ও জৈব কৃষির ওপর তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞানী দেবল দেব। সবুজ বিপ্লবের নাম করে কিভাবে চাষবাসের ক্ষেত্রে দেশী বীজ, দেশী কৃষিপ্রযুক্তিকে ধ্বংস করে উচ্চ ফলনশীল বিদেশী বীজ, সার, কীটনাশকের ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরী করা হয়েছে সারা দেশজুড়ে, যার পরিণতিতে গত চার দশক ধরে জমির উর্বরতা কমেছে, মাটি-জল-বাতাস বিষিয়ে উঠেছে, ক্রমাগত বাড়ছে চাষের খরচ, জলস্তর নেমে গিয়ে ফসল জ্বলে গেছে আর বিদেশী 'হাইব্রীড' ধান কিংবা 'জেনেটিকালি মডিফায়েড' বিটি তুলোর চাষ করতে গিয়ে নিঃস্ব হওয়া চাষীরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, এমনকি আমাদের রাজ্যেও— ডঃ দেবল দেব এবিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রাখেন। একপেশে ধরণের যে উন্নয়ন ভাবনা আমাদের দেশের শাসকরা এখন গ্রহণ করছে, তা যে বহু পূর্বেই বিভিন্ন জায়গায় ভুল প্রমাণিত, সে কথা তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন। মনস্যান্টোর মত হাতে গোনা কয়েকটা বহুজাতিক বিদেশী কোম্পানীর স্বার্থে 'উচ্চ ফলনশীল'-এর ধাপ্পা, রকমারি সার-কীটনাশকের ঢালাও বিক্রির উল্টোদিকে কোনও রাসায়নিক সার-কীটনাশক ব্যবহার না করে দেশী বীজের সাহায্যে সাবেকী জৈব পদ্ধতিতে বিকল্প চাষই যে লাভজনক, টেকসই, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষাকারী কৃষিপদ্ধতি—তা তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলেন। কৃষিকাজে ব্যবসায়ী স্বার্থে কীটনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কিভাবে মানবজীবনে ক্যান্সারের মত ব্যাধি ডেকে আনছে, তা নিয়ে প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন চিকিৎসক সঞ্জয় সেনগুপ্ত।

দ্বিতীয় দিন কৃষিতে রাসায়নিক দূষণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞানী ডঃ শুভাশিস মুখার্জী। কৃষি বিশেষজ্ঞ অনুপম পাল প্রচলিত রাসায়নিক চাষের ক্ষতিকর প্রভাবের বদলে বিকল্প জৈব কৃষি প্রযুক্তির নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি, দেশীয় বীজ, চাষের বন্ধু পোকা ও ক্ষতিকর পোকার ভূমিকা, কৃষিজমির বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখার গুরুত্ব ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গণবিজ্ঞান সমিতি যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল, তা যথেষ্টই চিত্তাকর্ষক। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও কৃষিবিজ্ঞান মেলাকে কেন্দ্র করে এলাকায় বেশ সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

বহুজাতিক কোম্পানীগুলি যখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে হাতের পুতুলের মত ব্যবহার করে বিদেশী বীজ-সার-কীটনাশকের যে বিপুল বাজারে আমাদের দেশের চাষীদের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদের এই আক্রমণের মুখে কৃষকদের সচেতন করতে এই ধরণের কৃষিবিজ্ঞান মেলা যে যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জাতীয় ও রাজ্য রাজনীতিতে প্রভাব কী ?

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

২০০২-এর দাঙ্গা পরবর্তী 'হিন্দু-ঝড়' এবার ছিল অনেক দুর্বল। মোদীর ঔদ্ধত্ব ও আত্মকেন্দ্রিকতায় বিরক্ত হয়ে এই প্রথমবারের জন্য তাঁর হয়ে 'সংঘ পরিবার' প্রচারে নামতে অস্বীকার করে। এতগুলি বাধা টপকেও ১১৭টি আসনে মোদীর নেতৃত্বে বিজেপির জয় নিঃসন্দেহে একটা বড় চমক। এমনকী, ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেই এই জয়কে যত না বিজেপি'র জয়, তার চেয়েও বেশি মোদীর ব্যক্তিগত সাফল্য বলে অভিহিত করছেন।

মোদীর এই ম্যাজিক সাফল্যের পিছনে কারণ কী? এক নম্বর কারণ, অবশ্যই নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর আকাশছোঁয়া ভাবমূর্তি। হিন্দুত্ব, গুজরাটি প্রাদেশিকতা ও 'উন্নয়ন'-এর ধ্বজাধারী এই সুউচ্চ ভাবমূর্তির ধারেকাছে কোনও বিরোধী নেতা এই মুহূর্তে গুজরাটে নেই। আর কে না জানে, প্রচার মাধ্যম থেকে শুরু করে বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলি, সকলেই এ'রকম 'কড়া প্রশাসক'-ই পছন্দ করে। সাম্প্রতিক কালে শিল্পপতিদের পছন্দের তালিকায় প্রথম দু'জন মুখ্যমন্ত্রীর নামই হল নরেন্দ্র মোদী এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য! মিডিয়া ও শিল্পপতি গোষ্ঠীগুলির আশীর্বাদে পুষ্ট হয়ে নরেন্দ্র মোদী তাঁর এই 'ভাবমূর্তি'কে ক্রমশ উজ্জ্বল করেছেন, পরিশেষে সাফল্যের সাথে ভোটে ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর হাত ধরেই যে গুজরাটে 'উন্নয়ন'-এর বন্যা বইবে, যেভাবেই হোক রাজ্যবাসীকে এ'কথা বিশ্বাস করাতে সমর্থ হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যে প্রায় ৩০টির উপর বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সেজ) গঠন, প্রতিবছর 'ভাইব্রান্ট গুজরাট' সম্মেলনে কয়েক লক্ষ কোটি টাকার লগ্নি ডেকে আনা, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে 'জ্যোতিগ্রাম প্রকল্প', শিল্প-সড়ক-পানীয় জলের উন্নয়ন— এই ছিল প্রচারের প্রাথমিক পর্বে মোদীর মূল হাতিয়ার। 'উন্নয়ন'-এর রাজসূয় যজ্ঞ কতটা শিল্পপতিদের স্বার্থে আর কতটা আমজনতার জন্য, ভবিষ্যতেই তা রাজ্যবাসীর কাছে পরিষ্কার হবে। আর তাতে, মোদীর পরিণতি অন্ধ্রের চন্দ্রবাবু নাইডুর মত হবে কিনা, তার বিচারও ভবিষ্যতের হাতেই তোলা থাকলেও এ'বারের মতো গুজরাটবাসী যে তাঁকে বিশ্বাস করেছেন, ভোটের ফলাফলে তা স্পষ্ট। তৃতীয়ত, 'উন্নয়ন'কে মূল হাতিয়ার করলেও, 'হিন্দুত্ব'-ই যে এখনও তাঁর হাতের তুরুপের তাস, সেকথা বিলক্ষণ মাথায় রেখেছেন নরেন্দ্র মোদী। তাই প্রচারের দ্বিতীয় পর্বে, 'উন্নয়ন'-এর সাথে সাথেই, উগ্র হিন্দুত্বের স্লোগানকে অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে মোদী সামনে নিয়ে আসেন। তাতে ২০০২-এর দাঙ্গা বিধ্বস্ত মধ্যগুজরাটের মুসলিম ভোট কংগ্রেসের ঝুলিতে গেলেও সারা রাজ্যের সংখ্যাগুরু হিন্দু ভোটের ঢল যায় মোদীরই দিকে। গুজরাটের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক তাস খেলায় তাঁর চেয়ে ভালো খেলোয়াড় যে এখনও জন্মায়নি, ভোটে জিতে আবারও তা প্রমাণ করলেন নরেন্দ্র মোদী। বিশেষভাবে লক্ষনীয়, নির্বাচনে জিতে আসার পর-পরই, 'কট্টর হিন্দু নেতা'র ভাবমূর্তি ঝেড়ে ফেলে আবারও তিনি 'উন্নয়নকামী দক্ষ প্রশাসক'-এর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। কারণ নরেন্দ্র মোদী ভালোভাবেই জানেন, আগামী পাঁচ বছরের চলার পথে এই ভাবমূর্তি-ই তাঁকে প্রতিমুহূর্তে রক্ষা করবে, রসদ যোগাবে। 'মুখ' আর 'মুখোশ' বদলের এই খেলা ততদিনই চলবে, যতদিন না গুজরাটে নতুন কোনও রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয়।

অন্যদিকে, কংগ্রেসী ঘরানার সীমাহীন দুর্নীতি ও অদক্ষ প্রশাসন-ই হিমাচল প্রদেশে বিজেপির জয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। দেশের সর্বত্রই 'উন্নয়ন' বলতে বড় বড় শাসক দলগুলি যা বোঝে, অর্থাৎ দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের জামাই আদর করে ডেকে এনে রাজ্যে পুঁজি বিনিয়োগ করা, হিমাচল প্রদেশে এমনিতেই তার সুযোগ কম। কারণ রাজ্যটির অধিকাংশই পাহাড় পর্বতে ঘেরা। শিল্পপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ততটা লোভনীয় নয়। ফলে কংগ্রেসের হাত ধরে উল্লেখযোগ্য কোনও 'উন্নয়ন' গত পাঁচ বছরে এখানে হয়নি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নেতা ও মন্ত্রীদের অকথ্য দুর্নীতি—আর পাঁচটা পিছিয়ে পড়া রাজ্যে যেমনটা হয়। ফলে বিক্ষুব্ধ জনতার ভোটকে সম্বল করে সহজেই এরাজ্যে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সফল হয়েছে বিজেপি। যদিও তাতে ওরাজ্যের মানুষদের কতটা উপকার হবে, সে আলোচনা তর্ক সাপেক্ষ!

গুজরাট ও হিমাচলের নির্বাচনী ফলাফল আগামী দিনের জাতীয় রাজনীতিতে, এমনকী আমাদের রাজ্য-রাজনীতিতেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। হিমাচল প্রদেশকে ধরে এই মুহূর্তে সারা দেশে মোট ১০টি রাজ্যে ক্ষমতায় আছে এন ডি এ জোট, তার মধ্যে ৭টিতে এককভাবে বিজেপি। চলতি বছর আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন; এবং আগামী দেড় বছরের মধ্যে যে কোনও সময় ডাকা হবে পার্লামেন্ট নির্বাচন। গুজরাট ও হিমাচলে ভোটে জিতে স্বাভাবিকভাবেই দ্বিগুণ উদ্যমে এই নির্বাচনগুলিতে ঝাঁপাবে বিজেপি। আর বিজেপির এই পুনরুত্থানকে ঠেকাতে কেন্দ্রে কংগ্রেস-সিপিএমের সম্পর্কও আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠারই প্রবল সম্ভাবনা। বস্তুত, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের যাবতীয় কর্মসূচী দেশের মাটিতে রূপায়ণ করা, উদারিকরণ-বেসরকারিকরণ-সেজ গঠন ইত্যাদি সমস্ত মৌলিক প্রশ্নেই কংগ্রেস-সিপিএমের যাবতীয় মতপার্থক্য ক্রমশ দূরীভূত হওয়াতে বহুপূর্বেই এই ঘনিষ্ঠতার ভিত তৈরি হয়ে গেছে। দিল্লীতে কংগ্রেস সিপিএমের এই গা-ঘেষাঘেষিতে স্পষ্টতই সমস্যায় পড়বেন পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস নেতারা— সিপিএম বিরোধিতাকে মূলধন করেই যাঁরা এতদিন চালিয়ে এসেছেন। ফলে সিপিএম বিরোধী প্রধান শক্তি হিসাবে মমতা ব্যানার্জী তথা তৃণমূলের বিশ্বাসযোগ্যতাই আরও বাড়বে। অতি সম্প্রতি বলাগড় উপনির্বাচনের ফলাফলও সেইদিকেই ইঙ্গিত করছে। এমতাবস্থায়, একদিকে দিল্লীতে কংগ্রেস ক্রমশ সিপিএমের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় এবং রাজ্যে কংগ্রেসের গণভিত্তিতে দ্রুত ভাঁটা পড়ায়, এই দলটির সঙ্গে আপাতত দূরত্ব বজায় রেখে চলাটাই যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে, তৃণমূল নেত্রী বিলক্ষণ সে কথা বুঝেছেন। আবার বিজেপি এরাজ্যে খুব একটা প্রভাবশালী না হওয়াতে এই দলটির সঙ্গেও আপাতত দূরত্ব বজায় রেখে চলছেন মমতা ব্যানার্জী। যদিও খেয়াল রাখা প্রয়োজন, আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও তিনি এনডিএ জোট ছেড়ে আসার কথা ঘোষণা করেননি। ফলে কেন্দ্রিয় রাজনীতিতে বিজেপির প্রভাব নির্ধারক হয়ে উঠলে তিনি ঠিক কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, আগামী দিনেই তা পরিষ্কার হবে। আগামী লোকসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতি মাসের শেষের দিকেই সারা দেশের এনডিএ জোট শরিকদের নিয়ে বৈঠক ডাকার কথা ঘোষণা করেছে বিজেপি। এই বৈঠকে যোগ দেওয়া অথবা না দেওয়া থেকেও আগামী দিনে এরাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচী তথা পরিকল্পনার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক আগে, এই ইঙ্গিত পাওয়াটা নানান কারণেই বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

বলাগড় : নির্বাচনী ফলাফলের শিক্ষা

সরিফুল ইসলাম

সম্প্রতি বলাগড় বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ফলাফল সিপিএম তথা বামফ্রন্টের বিকল্পের প্রশ্নটাকে সজোরে হাজির করেছে। যদিও এই কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিএম প্রার্থী ভুবন প্রামাণিক, তথাপি এই জয় সিপিএম তথা বামফ্রন্টের কাছে আনন্দের চেয়ে উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ গ্রাম-প্রধান বলাগড়ে সিপিএম-এর ভোট কমেছে প্রায় দশ হাজার। বস্তুত, গত চারটি বিধানসভা নির্বাচনের (১৯৯৬, ২০০১, ২০০৬, ২০০৭) মধ্যে এবারই সিপিএম প্রদত্ত ভোটের সব থেকে কম শতাংশ (৪৫.৬৭ শতাংশ) পেয়েছে।

একসময় জমি দখলের আন্দোলনে দৃঢ়ভাবে ভূমিহীন, গরীব কৃষকদের পক্ষে দাঁড়ানোর কারণে, গ্রামাঞ্চলে বিশেষত কৃষকদের মধ্যে সিপিএমের মজবুত সংগঠন। অপরদিকে, ঐতিহাসিকভাবে, কংগ্রেস সহ অন্যান্য ডানপন্থী শক্তির পরিচয় জমিদার জোতদার শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে। ফলে, বলাগড়ের মতো গ্রাম-প্রধান কেন্দ্রে এক ধাক্কায় বামফ্রন্টের ১০,০০০ ভোট কমে যাওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষক সমাজের একটা বড় অংশ যে সিপিএম-কে আর তাঁদের স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিনিধি বলে মনে করছেন না, এটা স্পষ্ট। বরং সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে জমি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা, জোতদার-জমিদার আমলের বীভৎসতাকেই কৃষকমানসে ফিরিয়ে আনছে।

সিপিএম-এর ভোট কমার পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, সংখ্যায় হার হলেও নৈতিক জয় তাঁদেরই হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা তৃণমূল প্রার্থী অসীম মাঝি পেয়েছেন মোট ভোটের ৩৯.৪৫ শতাংশ। মনে রাখা দরকার, এবার তৃণমূল একলা লড়ে এই ফল করেছে; আর ২০০৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র সঙ্গে জোট করে বলাগড় কেন্দ্রে তৃণমূল পেয়েছিল ৩৮ শতাংশ ভোট। অর্থাৎ তৃণমূল যে একটা বড় সংখ্যক নতুন ভোটার আকৃষ্ট করতে পেরেছে এটা স্পষ্ট। অন্যদিকে, মোট ভোটের মাত্র ৪.৪৭ শতাংশ পেয়ে ধরাশায়ী হয়েছে কংগ্রেস। স্পষ্টতই, সিপিএম-এর বিকল্প বা বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। সিপিএম যত খোলাখুলিভাবে, কথায় ও কাজে, পুঁজিবাদের পক্ষে সওয়াল করছে, তত সিপিএম-কংগ্রেসের পার্থক্য মুছে যাচ্ছে এবং কংগ্রেসও ইউ.পি.এ-এর বৃহৎ শরিক সিপিএম-কে নিজের রাজ্যে 'পুঁজিবাদ করার' সবরকম ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। ২০০১-এর তুলনায় এবারের নির্বাচনে বিজেপি-র আড়াই হাজারেরও বেশি ভোট বাড়াটাকে কেন্দ্রে কংগ্রেস-সিপিএম জোটের বিরুদ্ধে জনগণের পিছিয়ে থাকা অংশের মতামতের একটা প্রতিফলন হিসেবে ধরা যেতে পারে।

বলাগড় নির্বাচনের ফল বেরোনোর পরদিন নন্দীগ্রামে জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— "বলাগড় একটা ডাক দিয়েছে— বিরোধীদের ভাগাভাগি করেও এখন আটকানো যাবে না। সিপিএম-বিরোধী ভোট এক জায়গাতেই পড়বে।" (সূত্র আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪-১-২০০৮)। বাজারি সংবাদমাধ্যম-গুলিও প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে বলাগড়ে যদি বিজেপি ও তৃণমূলের ভোট একজায়গায় পড়ত, তবে তার যোগফল (৮৮৩৩৫+১৬৯১ =৯০৫২৪) সিপিএম-এর ভোটের (৬০১০১) থেকে বেশি হত। অতএব, সিপিএম-কে হটানোর স্বার্থে তৃণমূল বিজেপির জোটবদ্ধ হওয়া কাম্য।

কিন্তু শাসকশ্রেণী যতই ক্ষমতার আসনে তাদেরই কোনো না কোনো দলকে বসাতে চাক, সংগ্রামী মানুষ জানে যে সিপিএম-এর বিকল্প কখনোই তৃণমূল-বিজেপি জোট হতে পারে না। আর তাই বাস্তবটাও সরল পাটিগণিত মেনে চলে না। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তৃণমূল-বিজেপি জোটবদ্ধভাবে বলাগড়ে লড়লে, তৃণমূল অনেক ভোটার হারাত। যাঁরা সাম্প্রতিককালে জমিরক্ষার আন্দোলনে তৃণমূলের সক্রিয় ভূমিকা দেখে এবং বিকল্প শক্তির অভাবে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা অনেকেই বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক, জনবিরোধী শক্তির জোটকে ভোট দিতেন না। বরং এধরনের নীতিহীন জোট সিপিএম-এরই আরো সুবিধে করে দিত।

সমস্যা হল, তৃণমূল কংগ্রেস তার শ্রেণীচরিত্রের কারণেই কংগ্রেস-বিজেপির থেকে নীতিগত বিচ্ছিন্নতা টানতে অপারগ। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল অভিযোগ এই নয় যে তারা ভারতবর্ষে নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রবর্তক, যেই নীতির ধারাবাহিকতায় আজ কৃষকদের জমি কেড়ে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। মূল অভিযোগ হল, কংগ্রেস সিপিএম-এর সাহায্য নিয়ে কেন্দ্রে সরকার চালাচ্ছে! আর যেহেতু বিজেপি কেন্দ্র সরকারের বিরোধী শক্তি, তাই বিজেপি-র সিপিএম-বিরোধিতাও সংশয়াতীত! তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, সিপিএম-বিরোধিতার স্বার্থেই তিনি বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ত্যাগ করবেন না। তাই গুজরাটে সংখ্যালঘু নিধন বা রাজস্থানে কৃষক আন্দোলনের ওপর গুলিচালনা— সিপিএমকে হটানোর স্বার্থে তিনি সবকিছুর সাথেই আপস করতে রাজি।

শাসকশ্রেণী সবসময়ই চায় সমাজে মেরুকরণটা তার নিজেরই দুটো অংশের মধ্যে হোক। যেমন, কেন্দ্রে ইউ.পি.এ. বনাম এন.ডি.এ. এবং রাজ্যে সিপিএম বনাম তাবৎ ডানপন্থী শক্তি। এই মেরুকরণ যেমন নির্বাচনের মাধ্যমে পালাবদলের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের মোড়কটিকে রক্ষা করে, তেমনই শাসকশ্রেণীকে নিরবচ্ছিন্নভাবে, ন্যূনতম প্রতিরোধে, তার স্বার্থরক্ষাকারী সমস্ত পলিসি রূপায়ণ করতে সাহায্য করে। জনগণের মধ্যেকার স্বাভাবিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে দলীয় বিরোধিতায় পর্যবসিত করে মেহনতী জনতার সংগ্রামী ঐক্যের মূলে আঘাত হানে।

কিন্তু শাসকশ্রেণী যেমনটা চায়, তেমনটা সবসময় ঘটে না। মানুষ শিক্ষাগ্রহণ করে আন্দোলন থেকে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের গণআন্দোলন ও সমাজে সর্বস্তরে তার প্রভাব মানুষকে যেমন অনেকাংশে কংগ্রেস-বিজেপির সংগ্রামবিমুখতা সম্পর্কে সচেতন করেছে, তেমনই আন্দোলনের গোটা পর্যায় জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকাও অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শত ইচ্ছা সত্ত্বেও সমাজে অন্তত সিপিএম বনাম ডানপন্থী শক্তির মেরুকরণ ঘটেনি। সংগ্রামী মানুষ একদিকে যেমন এমন একটি শক্তিকে খুঁজছে যে শুধু সিপিএম দলটির নয়, সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিপরীতে দাঁড়ানো একটি শক্তি; তেমনই বিকল্পের অভাবে বাম-গণতান্ত্রিক একটা বড় অংশ এখনো সিপিএম-এর দিকেই ঝুঁকে আছে। তাই বলাগড় নির্বাচনে সংগ্রামী বামশক্তি সিপিআই(এম.এল) লিবারেশনের গতবারের তুলনায় প্রায় ২০০০ ভোট বাড়াটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বোঝাই যাচ্ছে এই বাড়তি ভোটটা বাম-গণতান্ত্রিক ভোটের একটা অংশ, যা আগে বামফ্রন্টের ঝুলিতেই যেত।

রাজ্য রাজনীতিতে লিবারেশনের মতো একটা ক্ষুদ্র শক্তিকে যাঁরা ভোট দেন, তাঁরা অবশ্যই সচেতনভাবে একটা বিকল্প নীতির পক্ষে তাঁদের রায় দেন। স্বাভাবিকভাবেই, শুধু লিবারেশন নয়, রাজ্যের সমস্ত সংগ্রাম বামশক্তি যদি এক জায়গায় আসে, তাহলে সেই সম্মিলিত শক্তি জনগণের বিকল্পের আকাঙ্ক্ষাকে অনেক বেশি কার্যকরীভাবে ধারণ করতে পারবে। প্রতিক্রিয়ার উত্থানকে প্রতিহত করতে, জনগণের রায়কে শাসকশ্রেণীরই কোনো না কোনো অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাকে আটকাতে, এবং সর্বোপরি জনগণের লড়াকু সক্রিয়তাকে বিকশিত করতে, আজ তাই শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কিত দলগুলির বাইরে সংগ্রামী বামেদের স্বতন্ত্র, ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ একান্ত জরুরি।

স্থায়ী বন্যাপ্রতিরোধ ও গণবন্টন ব্যবস্থায় দুর্নীতি বন্ধের দাবিতে

কান্দি মহকুমায় গণডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কান্দি: কান্দি মহকুমায় বন্যা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। প্রতিবছর নিয়ম করেই বন্যা হয় এই মহকুমায়। তাই স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধে এখানকার মানুষের আন্দোলন দীর্ঘদিনের। এদিকে সারা রাজ্যের মতো এখানেও রয়েছে রেশন নিয়ে নানারকম দুর্নীতি। বিভিন্ন জায়গায় স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় চলছে হকার উচ্ছেদ অভিযান। জনসাধারণের এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে 'মজদুর ক্রান্তি পরিষদ' মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি। গত ২৪ ডিসেম্বর কমিটির পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের কাছে একটি গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। ওইদিন কমিটির পক্ষ থেকে মহকুমাশাসকের কাছে একটি দাবিসনদ পেশ করা হয়। দাবিসমূহ নিম্নরূপ—

বন্যার বিষয়ে মূল দাবি— (১) স্থায়ীভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং (২) জলাধারগুলির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। বন্যার বিষয়ে আশু দাবি— (১) যতদিন স্থায়ীভাবে বন্যা প্রতিরোধ না হচ্ছে ততদিন নদী বাঁধগুলি শুখা মরশুমে মেরামত করতে হবে। (২) প্রতি গ্রামে ফ্লাড সেন্টার তৈরি করতে হবে। (৩) বন্যার সময় দুর্গত মানুষ ও গবাদি পশুর পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। (৪) বন্যা পরবর্তী সময়ে কৃষকদের পর্যাপ্ত বীজ ও সার দিতে হবে। (৫) বন্যায় ভেঙে যাওয়া ঘর তৈরি করে দিতে হবে। (৬) বন্যাপ্রবণ এলাকায় চাষীদের জন্য শষ্যবীমা চালু করতে হবে।

গণবন্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে দাবি— (১) দুর্নীতিমুক্ত গণবন্টন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। (২) রেশনে কী কী সামগ্রী পাওয়া যায়, তার মূল্যতালিকা, কোন গ্রাহকদের কার্ডে কতটা প্রাপ্য তার তালিকা রেশন দোকানগুলিতে টাঙিয়ে দিতে হবে। (৩) দুর্নীতিগ্রস্ত ডিলার এবং তার সাথে যুক্ত অন্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। (৪) প্রাপ্য রেশন কার্ডের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে হবে।

এছাড়াও হকারদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের দাবি জানানো হয়।

৬ জন প্রতিনিধি মহকুমাশাসকের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন আশীষ পাত্র, গোকুল হাজরা, বুদ্ধদেব মণ্ডল, নিতাই মণ্ডল, হারুন রসিদ এবং চাঁদু দাস।

আলোচনায় মহকুমাশাসক বলেন— স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধের ব্যাপারে সরকারি ভাবে কোন আলোচনা হয়নি। বিভিন্ন জায়গায় ফ্লাড সেন্টার তৈরি করা হবে। কিন্তু স্থানাভাবে সমস্ত জায়গায় সম্ভব হচ্ছে না। গবাদি পশুর খাবার দেওয়া হয় কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। ভেঙে যাওয়া ঘরবাড়ি তৈরির এবং সার বীজ ইত্যাদির জন্য খরচ দেওয়া হয় কিন্তু দলবাজির জন্য সমস্ত মানুষ তা পান না। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। শষ্য বীমার প্রস্তাবটি ভালো। এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। গণবন্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দ্রব্য তালিকা ও মূল্য তালিকা টাঙানোর জন্য বলা হয়েছে। দুর্নীতি দূর করার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। হকারদের রাস্তা থেকে সরে এসে মার্কেটে বসতে হবে— তার জন্য তাঁরা সরকারের কাছে সাহায্য চাইতে পারেন। হাসপাতালের কাছে যে হকাররা রয়েছেন তাঁদের চারফুট করে জায়গা দেওয়া যায় কিনা এ বিষয়ে পৌরসভার সঙ্গে কথা বলা হবে।

ওইদিন মহকুমা শাসক দপ্তরে অবস্থানে বক্তব্য রাখেন MKP মুর্শিদাবাদ জোনাল কমিটির নেতা সুভাষ পাণ্ডে, গোকুল হাজরা, আশিষ পাত্র এবং কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে আভাষ মুন্সি। বক্তারা সকলেই গণআন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের পক্ষে তাদের মত ব্যক্ত করেন। দাবিগুলির সপক্ষে গোটা মহকুমা জুড়ে আন্দোলন প্রসারিত করার কথা ঘোষণা করা হয়। শুধু স্বতঃস্ফূর্ত তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ নয়, সুনির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে ধারাবাহিক সংগঠিত আন্দোলনের কথা ঘোষিত হয়।

হিন্দুস্তান মোটরসে বার্গেনিং এজেন্ট নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৯ই জানুয়ারী হিন্দুস্তান মোটর্সে বার্গেনিং এজেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনায় কোন ইউনিয়ন শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করবে, তা নির্ধারিত হয় এই নির্বাচনের মাধ্যমে। কারখানার মোট প্রায় ৪৩০০ শ্রমিক কর্মচারী এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ২০০২ সাল থেকে এই নির্বাচন হিন্দুস্তান মোটরস কারখানায় হচ্ছে এবং প্রথম দুবারই সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারি ইউনিয়ন একান্ন শতাংশের বেশী ভোট পেয়ে বার্গেনিং এজেন্ট নির্বাচিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত বছর মার্চ মাস থেকে এখানে ৬১ দিনের এক ঐতিহাসিক ধর্মঘট সংগ্রাম চলে।

এবারের নির্বাচনে কোনও ইউনিয়নই সোল বার্গেনিং এজেন্ট নির্বাচিত হয়নি। সিটু ৪৯ শতাংশ এবং এস এস কে ইউ ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে, ফলে এই দুটি ইউনিয়ন নিয়ে বার্গেনিং কাউন্সিল গঠিত হবে। সিটু তার মধ্যে প্রিন্সিপাল বার্গেনিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে। অন্যান্য আরও তিনটি ইউনিয়নের কেউ পনেরো শতাংশের বেশী ভোট না পাওয়ায় তারা বার্গেনিং কাউন্সিলের সভ্য হবে না।

মনে রাখা দরকার, হিন্দুস্তান মোটরস কারখানায় মালিকের স্বৈরাচার, ডি এ ফ্রিজের বিরুদ্ধে ও বদলী স্থায়ীকরণ এবং ঠিকা শ্রমিকদের কাজে ফেরানোর দাবীতে ধর্মঘট সংগ্রাম চালাতে গিয়ে সাসপেনশন-টার্মিনেশনের শাস্তির শিকার হয়ে রয়েছেন বহু লড়াকু শ্রমিক। ট্রান্সফারের আক্রমণও নামছে অনেকের ওপর।

দুর্নীতির অভিযোগ বার্ড ফ্লু প্রতিরোধেও

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বার্ড ফ্লু-র সংক্রমণ মারাত্মক চেহারা নিয়েছে। এটা ঠিক যে, পশ্চিমবাংলার ভেঙ্গে পড়া স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর কারণে এই সংক্রমণ আরও ভয়ংকর চেহারা নিয়ে মানুষের মারণরোগ হিসেবে দেখা দিতে পারে। অবশ্য প্রতিবছর যখন মানুষ চিকিৎসার সুবিধা না পেয়ে সাধারণ রোগ-ব্যাধিতে মারা যান, তখন এই সরকারী তৎপরতার সিকিভাগেরও দেখা মেলে না। এ পর্যন্ত ১৯,৩০,০২৪টি মুরগী মারা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় যে কালিং টীম নিয়োগ করা হচ্ছে, তাদের পাওনাগণ্ডা দেওয়ার ব্যাপারে নানারকম দুর্নীতির অভিযোগ আসছে। আর মুরগিপিছু যে ৪০ টাকা ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হয়েছে, একে তা খুবই কম, তার ওপর এর ভাগ আবার চলে যাচ্ছে পঞ্চায়েতের নানা স্তরের দলীয় নেতা কিংবা দালালদের পকেটে। যারা মুরগী চাষ করেন, তাদের মড়ার ওপর খাড়ার ঘা অবস্থা।

বেনজির হত্যা ও সাম্প্রতিক পাকিস্তান

সুমন্ত দাস

আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সংসদীয় নির্বাচন। নিহত নেত্রী বেনজির ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি নাওয়াজ শরিফ-এর পিএমএল-এন সবাই বেশ আনন্দ সহকারেই অংশগ্রহণ করতে চলেছেন এই নির্বাচনে। এর আগে পিপলস্ পার্টি নেত্রী বেনজির নিহত হওয়ায় পাকিস্তানে নির্বাচন হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। তবে বেনজির-এর মৃত্যুর পর মার্কিন সচিব কণ্ডোলিসা রাইস শ্রীমতী ভুট্টোকে 'গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক' বলে ভূয়সী প্রশংসা করলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন পাকিস্তানে যথারীতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে! এরপর কদিনের মধ্যেই নওয়াজ শরিফ নির্বাচন বয়কট-এর অবস্থান ছেড়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। পাকিস্তান পিপলস্ পার্টিও বেনজির-এর পুত্রকে উত্তরাধিকারি হিসেবে তুলে ধরে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। গত ৩০শে ডিসেম্বর বেনজির তনয় বিলাওয়াল জানিয়ে দেন তাঁর মা মনে করতেন 'গণতন্ত্রই হল শ্রেষ্ঠ প্রত্যাঘাত'। দৃশ্যতই বেনজিরের মৃত্যু বা হত্যার পরবর্তীতে পাকিস্তান একটু তাড়াতাড়িই 'স্বাভাবিক' হয়ে এল। মুশারফ, বিলাওয়াল, নওয়াজ শরিফ সবাই 'গণতন্ত্রের' রক্ষাকর্তা হয়ে উঠলেন। পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন, প্রতিষ্ঠিত হবে 'গণতন্ত্র'।

গত ২৭শে ডিসেম্বর বেনজির ভুট্টোর নিহত হওয়ার ঘটনা সারা বিশ্বকেই কিছুটা হতচকিত করে দিয়েছিল। আততায়ীর হাতে মৃত্যু নাকি বিস্ফোরণ জনিত দুর্ঘটনা— এই জল্পনা চলতে থাকে। কে বা কারা বেনজির মৃত্যুর জন্য দায়ী? মৃত্যু না হত্যা? এই নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে, সম্ভবত চলতে থাকবে আরও কিছুকাল। ব্যাপারটির দিকে এবার একটু নজর দেওয়া যাক। বেনজিরের মৃত্যুর চব্বিশ ঘন্টা পর হংকং থেকে প্রকাশিত 'এশিয়া নিউজ' তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত কলামে ঘোষণা করেন যে আল-কায়দা এই হত্যার দায় স্বীকার করেছে। কিন্তু পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ আলকায়দা তথা তালিবান-এর মুখপত্র মৌলনা মহম্মদ ওমর, জঙ্গীরা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত— এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। এই ধরনের অভিযোগ সরকারি অপপ্রচার বলে সরাসরি খারিজ করেন ওমর। তিনি বলেন, ''আমরা এটা কড়া ভাষায় অস্বীকার করছি যে বাইতুল্লা মেহসুদ (যাকে হত্যাকারী বলে রটানো হয়েছিল—লেখক) বেনজির-এর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনও মতেই জড়িত নন।'' মহম্মদ ওমর আরও বলেন, ''ঘটনা হলো আমরা মার্কিন বিরোধী কিন্তু পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ-কে আমরা শত্রু হিসেবে ভাবি না।'' পাকিস্তান সরকার এবং লণ্ডনস্থিত কিছু ব্যক্তি দ্বারা প্রকাশিত মেহসুদ-এর টেলিফোনের কথাবার্তার 'নথিভুক্ত' ভাষ্যের সত্যতা এর মাধ্যমে দুর্বল হয়ে পড়ে। গত ১৮ অক্টোবরের ঘটনার (সেদিন বেনজিরের ওপর হামলার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়) পরে বেনজির 'আউটলুক' পত্রিকার সাংবাদিক লাহরস্থিত আমির মিরকে বলেন যে তাঁর নিজস্ব অনুসন্ধানে তিনি জানতে পেরেছেন পাকিস্তানে সরকারি উচ্চ পর্যায়ে অবস্থিত বেশ কিছু পদাধিকারী ওই দিনের বিস্ফোরণ কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বেনজিরের মতে পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা চক্র লস্কর-এ ছন্দ্রগ্বঙ্গ কর্মী আবদুল রহমান সিংধিকে, এ কাজে ভাড়া করেছিলেন। উল্লেখ্য ২০০৪ সালে ৪ঠা মে করাচিস্থ মার্কিন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে বোমা বিস্ফোরণ-এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সিংধিকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু বেনজির পাকিস্তানের পৌছানোর কিছু পূর্বেই সিংধিকে রহস্যজনক ভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানের অনেকেই মনে করেন, প্রশাসনের একাংশের মদত ছাড়া ছন্দ্রগ্বঙ্গ বেনজিরে ওপর আক্রমণ পরিচালনা করতে পারে না। অনেকেই মনে করেন আল-কায়দা পাক প্রশাসনের ব্যবহৃত একটি ধূম্রজাল মাত্র।

আরও একটা গুরুতর ব্যাপার-এর দিকে নজর দেওয়া যাক। পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহল 'আউটলুক' পত্রিকার সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন যে মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে বেনজির ভুট্টো পূর্বনির্ধারিত ৮ জানুয়ারির নির্বাচনকে জালিয়াতি করে অপহরণ করার মুশারাফ-এর পরিকল্পনাকে ফাঁস করার কথা ঠিক করেছিলেন। বেনজির যে তথ্য ফাঁস করার চেষ্টায় ছিলেন তদানুসারে ইসলামাবাদের একটি বাড়িতে একটি রিগিং কক্ষ তৈরি করা হয়েছিল। এই রিগিং কক্ষের কাজ ছিল নির্বাচনী ফলাফলকে মুশারফের দল পএমএল-কিউ ছত্ত্বত্ত্ম-ত্বগ্ব-এর অনুকূলে সাজিয়ে নেওয়া। ২৫শে ডিসেম্বর বেনজির-এর উদ্দেশ্যে পাঠানো ই-মেইল-এ জানানো হয় ব্রিগেডিয়ার রিজাউল্লা খান চিব্, পাক ইন্টালিজেন্স ব্যুরো পরিচালক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ইজাজ হুসেন সাহ্-এর সঙ্গে এই ব্যাপারে হাত ধরাধরি করে কাজ করছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৮ই অক্টোবর পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে বেনজির অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন, যে উক্ত ইজাজ হুসেন সাহ তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছেন। লন্ডনে থাকাকালীন 'আউটলুক' পত্রিকার সাংবাদিক আমির মিরকে তিনি জানিয়েছিলেন এই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে মুশরাফকে এক পত্র লিখে প্রশাসনের যে সমস্ত পদাধিকারী এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত তাদের নাম উল্লেখ করেন। বেনজিরের বক্তব্য অনুযায়ী মুশারফ সম্ভবত এই চিঠিটিকে তাঁর পক্ষে কাজে লাগিয়ে বেনজিরকে হত্যা করার আদেশ দেন। এই সমস্ত তথ্য ও টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলে যে সমস্ত চিত্র প্রকাশ পেয়েছে তাতে বেনজিরকে হত্যা করা হয়েছে এই অনুমানই দৃঢ় হয়।

লক্ষণীয় বেনজিরের হত্যার নিন্দা ও বেনজিরকে 'গণতন্ত্রের পূজারী' বলে প্রশংসা করলেও মার্কিন কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের জন্য মুশারফকে কোনও রকম তিরস্কার করেননি, তার ওপর কোনও রকম চাপ সৃষ্টিও করেননি। মার্কিন সচিব নেবারোপন্টের মাধ্যমে মুশারফ-বেনজির কোয়ালিশন-এর ফর্মুলা মার্কিন মুলুকের কর্তারা বাতলেছিলেন। তাতে সম্ভবত বেনজির একটু গাঁই-গুঁই করছিলেন। আর বেনজিরকে সামনে রেখে উদারপন্থীদের উত্থান-এর যে সম্ভাবনা বিরাজ করছিল সেটা আখেরে যেকোনো কর্তৃত্ব এবং শেষমেশ মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে চলে যেত কিনা বলা যায় না। ফলে বেনজিরের মৃত্যুতে মার্কিন কর্তৃপক্ষের মধ্যে দুরকম মত লক্ষ করা গেছে। ডেমোক্র্যাট প্রার্থী সেনেটের হিলারি ক্লিন্টন অবশ্য বেনজিরের মৃত্যুর দায় মুশারফ-এর ওপর চাপিয়ে তাকে এক হাত নিয়েছেন। তবে বুশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুশারফ বিরোধী কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অবশ্য যে কোনও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের মূল নায়করা নেপথ্যে থেকে যান, কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিম্ন পদাধিকারী কেউ কেউ বলির পাঁঠা হন। এক্ষেত্রেও হয়ত তাই হবে। তবে যাইহোক পাকিস্তানে আপাতত মার্কিন মদতপুষ্ট 'গণতন্ত্র' বিঘ্নিত হবার কারণ দেখা যাচ্ছে না।

পরিশেষে বলা যাক, বেনজির ছিলেন ব্রিটিশ মার্কিন ঘরানার একজন বুর্জোয়া উদারনীতিবিদ। তিনি সত্যিকারের গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন এমনটা মনে করাটা ভুল হবে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কোনও প্রেক্ষাপট তাঁর ছিল না। মুশারফ যখন আফগানিস্তানের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য পাকিস্তানকে বুশের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন তখন কোনও আওয়াজ তোলেননি বেনজির। ইরাক আগ্রাসনকে কোনওরকম নিন্দা করেছেন বেনজির এমন তথ্যও নেই। পাকিস্তানের মেহনতী জনগণকে নিয়ে স্বৈরশাসন বিরোধী কোনওরকম সংগ্রাম করার ইতিহাসও তাঁর ছিল না। কাজেই বেনজির হত্যা মানে গণতন্ত্রের হত্যা এমনটা মনে করে চোখের জল ফেলার কোনও কারণ নেই। ভারতসহ বিশ্বের সমস্ত গণতন্ত্রবিরোধী রাজনৈতিক শক্তি বেনজিরকে গণতন্ত্রের দেবীর আসনে বসাবার যে প্রচার চালাচ্ছেন, মুশারফ বিরোধী অবস্থান নেওয়ার সাথে সাথে এই সমস্ত অপপ্রচার সম্বন্ধেও সতর্ক থাকতে হবে। স্বৈরশাসনের সংস্কৃতিতে পালিত কন্যা বেনজির-এর কাছ থেকে বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তির পাবার প্রায় কিছুই ছিল না বললেই চলে।

পাকিস্তানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের দুর্বলতার সুযোগে বেনজির মুশারফ-এর মতে রাজনৈতিক রাষ্ট্রনায়কদের বিন্যাস ও সমবায় চলতে থাকবে।

ডানকুনিতে বিরাট জমি অধিগ্রহণ প্রকল্প

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

শিল্প তালুক। 'শিল্প তালুক? বলেন কি? এখনকার ফ্লাওয়ার মিল, বিস্কুট কারখানা, গ্রীন-ফুড কারখানা পড়েছে তো অধিগৃহীত অঞ্চলে। তার মানে সেগুলি ভাঙা হবে।' আমরা কৌতূহলী হয়ে পড়ি। 'আরে হ্যাঁ, শিল্প ভেঙে তার ওপর আবার শিল্প। শিল্পায়ন বলে কথা।' এবারে প্রচণ্ড ব্যাঙ্গাত্মক ডাঃ আদক।

২০০৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'ডানকুনি জমি বাঁচাও কমিটি' গড়ে ওঠে। এলাকার বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধী বামপন্থী দলগুলিও এই কমিটিতে যোগ দেয়। এমনকি ফরওয়ার্ড ব্লকও কিছু কর্মসূচীতে উপস্থিত থাকে। কমিটির নেতৃত্বে দিল্লী রোড এবং দুর্গাপুর রোড অবরোধ হয়। মিটিং মিছিল, প্রচার চলতে থাকে। ডি.এল.আর.ও কে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়। সরকার বিরোধী ক্ষোভে মানুষ ফুঁসতে থাকেন। সাথে সাথেই ছুটে আসে সিপিএমের নেতৃবৃন্দ। চণ্ডীতলার বিধায়ক ভক্তরাম পান, চাঁপদানির জীবেশ চক্রবর্তী, শ্রীরামপুরের এম.পি শান্তশ্রী চ্যাটার্জী এমনকি কলকাতা থেকে রবীন দেব-ও গিয়ে মিটিং করেন। লোকেদের প্রাণপণে বোঝাতে থাকেন যে এই আন্দোলন অর্থহীন। কারণ বাস্তুভিটা বা শিল্প অধিগ্রহণ করা হবে না। অধিগ্রহণ করা হবে খালি ফাঁকা (ভ্যাকেন্ট) জমি। কিন্তু মানুষ এতে আশ্বস্ত হতে পারে না। বেগমপুর অঞ্চলের মানুষরা জানালেন, 'দেখুন শিল্পতালুক গড়ার জন্য যে ৭৭১ একর জমি নেবে বলছে তা নেওয়া হবে দুর্গাপুর রোডের পশ্চিম দিকে। তা ওখানে ফাঁকা জমি অত কোথায়? মেরে কেটে ৩৫০ একর হলেও হতে পারে। বাকী জমি নিতে গেলে তো বাস্তুতে হাত পড়বেই।' এছাড়াও আছে বাস্তুজমি হিসাবে অ-রেজিস্ট্রিকৃত এক বড় অঞ্চল। সরকারি খাতায় যা দেখানো হচ্ছে শালি জমি হিসাবে। সুতরাং প্রায় ৬০০০ ঘরবাড়ি ভাঙা যাবার আশংকা দানা বেঁধে উঠেছে।

মানুষের সন্দেহ আর আশঙ্কা দৃঢ় হয়েছে হুগলীর জেলাশাসকের ডাকা সর্বদলীয় (তৃণমূল কংগ্রেস যোগ দেয়নি) মিটিঙে। ২০০৭ সালের ২৮ অক্টোবর এই মিটিঙে কেএমডিএ-

এই অঞ্চলের সমস্ত জমির দাম কাঠাপ্রতি লক্ষাধিক হলেও সরকার ক্ষতিপূরণ বাবদ এক্ষেত্রে যা দাম স্থির করেছে প্রতি কাঠা

শালি জমি	১৩,২৬৩ টাকা
শুনা জমি	১৯,২৪৪ টাকা
বাস্তু জমি	১৯,৬৬৪ টাকা
অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীনে রাস্তা	৭,০০০ টাকা

ডিএলএফ ডানকুনি উপনগরী প্রকল্পের ওপর বই বিতরণ করে। যেখানে বলা হয়েছে বাস্তুচ্যুত মানুষকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য মূল উপনগরীর পাশে কলোনী গড়ে তোলা হবে। সেখানে বাস্তুচ্যুত প্রত্যেক মানুষকে ২ কাঠা করে জমি অথবা ৫ মিটার x ৫ মিটার একটি ঘর দেওয়া হবে। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ মানুষ প্রশ্ন তুলেছেন যে যদি বাস্তুচ্যুত কেউ না হবে তাহলে পুনর্বাসনের কি দরকার। প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ একজন ক্ষেতমজুর আর বিস্কুট কারখানার একজন শ্রমিক বলে ওঠেন, 'মূল উপনগরীতে হাজার বেডের আধুনিক হাসপাতাল হবে। পুনর্বাসন কলোনীতে হবে ১০ বেডের নাম-কা-ওয়াস্তে হাসপাতাল। বইতে লিখেছে। আমাদের কি চাকর বাকর ভাবছে?' 'হ্যাঁ চাকর বাকরই ভাবছে। রবীন দেব মিটিং করে বলে গেছেন। জমি গেলেও কর্মসংস্থান হবে। একলক্ষ তিরিশ হাজার ফ্ল্যাটে অনেক দারোয়ান লাগবে, কাজের লোক লাগবে।' এবার উত্তেজিত শোনার ডাঃ আদকের গলা। কমিটির সদস্যরা সমস্বরে জানালেন— 'আমরাও শেষ দেখে ছাড়ব। দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বদলে বর্ণবৈষম্যের দক্ষিণ আফ্রিকা বানিয়ে ছাড়বে দেখছি।'

সুতরাং, লড়াইয়ের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। এখন চলছে আইনী লড়াই। বাড়ি বাড়ি ঘুরে কমিটির সদস্যরা যোগাড় করছেন জমি দেওয়ার অসম্মতিপত্র। প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষই জমি দেওয়ার সম্মতি দেবে না বলে আশা করছেন তারা। তাদের মতে এই বিষয়টি এবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে কারণ ডানকুনীর জমি সরকার অধিগ্রহণ করছে ১৮৯৪ সালের আইনের ১১(২) ধারায় যেখানে জমির মালিকদের সম্মতি বাধ্যতামূলক। প্রসঙ্গত, সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল ১১(১) ধারায় যেখানে সম্মতি-অসম্মতির কোনো ব্যাপার ছিল না। জমি অধিগ্রহণ বিরোধী লড়াই ডানকুনির জমিতে ২০০৮ সালে শেষপর্যন্ত কি রূপ নেবে বা তার ফলাফলই বা কি হবে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই এখন ভবিষ্যতের গর্ভে!

স্বত্বাধিকারী অমিতাভ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১১, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ, ১০বি ব্রিক লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : অমৃত পৈড়া